وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-১০৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-৩১৮)

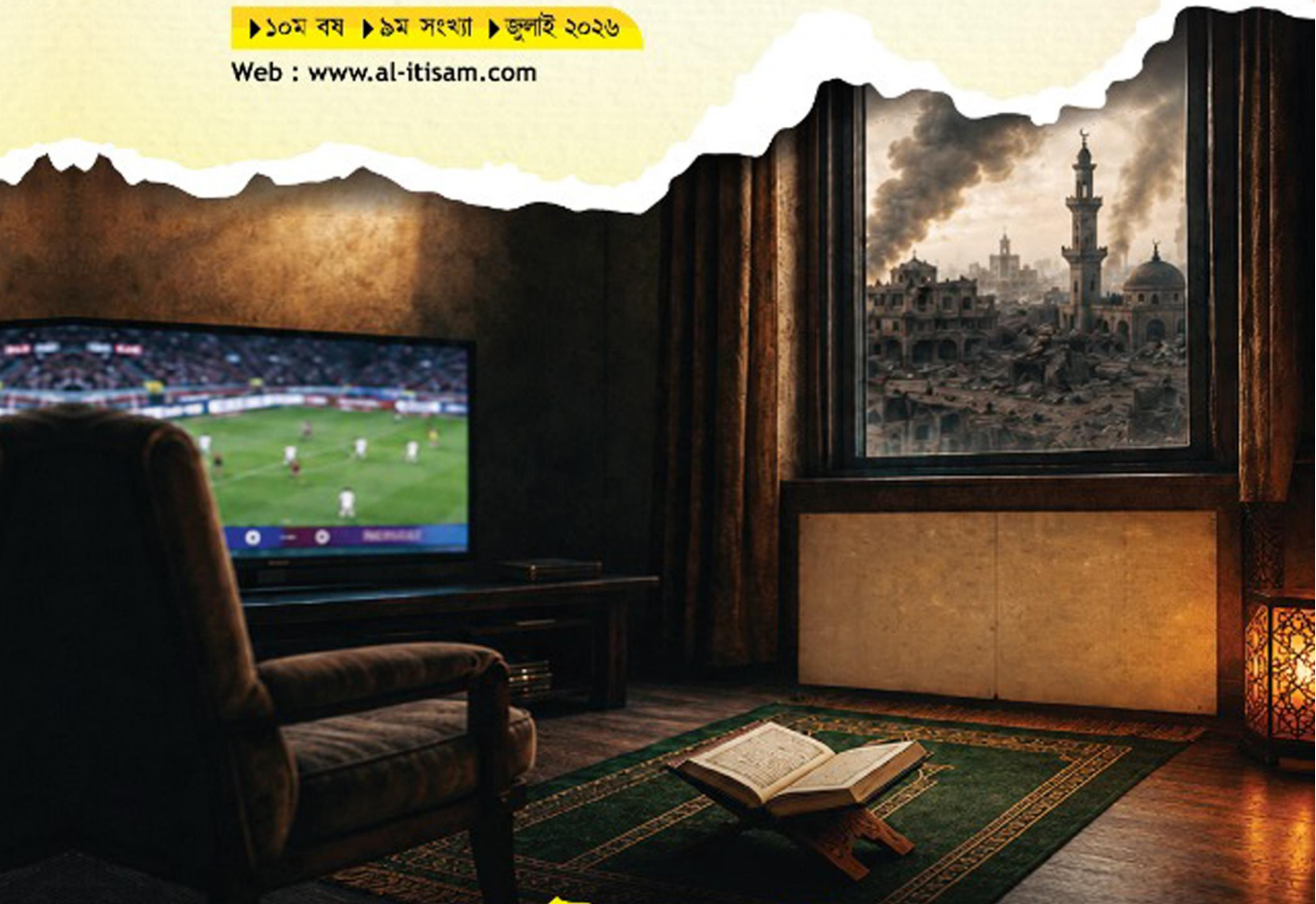
কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

১০ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুলাই ২০২৬

Web : www.al-itisam.com



ফুটবল বিশ্বকাপ উন্মাদনা: কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে মুসলিম উম্মাহ

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ١٠، محرم و صفر ١٤٤٨هـ/ يوليو ٢٠٢٦ العدد: ٩، الجزء: ١١٧
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য) — হিজরী ১৪৪৮ || ঈসায়ী ২০২৬ || বঙ্গীয় ১৪৩৩

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
জুলাই-০১	মুহাররম-১৫	বুধবার	৩.৪৮	৫.১৪	১২.০৩	৩.২১	৬.৫০	৮.১৭
জুলাই-০৫	মুহাররম-১৯	রবিবার	৩.৫০	৫.১৬	১২.০৩	৩.২২	৬.৫০	৮.১৭
জুলাই-১০	মুহাররম-২৪	শুক্রবার	৩.৫৩	৫.১৮	১২.০৪	৩.২৪	৬.৫০	৮.১৬
জুলাই-১৫	মুহাররম-২৯	বুধবার	৩.৫৫	৫.২০	১২.০৫	৩.২৫	৬.৪৯	৮.১৪
জুলাই-২০	সফর-০৫	সোমবার	৩.৫৯	৫.২২	১২.০৫	৩.২৭	৬.৪৭	৮.১২
জুলাই-২৫	সফর-১০	শনিবার	৪.০২	৫.২৪	১২.০৫	৩.২৮	৬.৪৫	৮.০৯
জুলাই-৩০	সফর-১৫	বৃহস্পতিবার	৪.০৪	৫.২৬	১২.০৫	৩.২৯	৬.৪৩	৮.০৬

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+২	+২	০
নারায়ণগঞ্জ	-১	-১	-১
নরসিংদী	-৩	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-৪	-৩	০
টাঙ্গাইল	-১	০	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+২
রাজবাড়ী	+৩	-৪	+৩
মুন্সিগঞ্জ	০	+১	০
গোপালগঞ্জ	+৪	-৪	+১
মাদারীপুর	+২	+২	০
মানিকগঞ্জ	+১	+২	+২
শরিয়তপুর	+২	+১	-১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৩	-৬
বান্দরবান	-৫	-৬	-১০
রাঙ্গামাটি	-৪	-৫	-৯
কক্সবাজার	-৩	-৪	-১১
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৪
নোয়াখালী	০	-১	-৫
লক্ষ্মীপুর	+১	০	-৩
চাঁদপুর	০	০	-২
ফেনী	-২	-৩	-৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+১	-৩	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৫	+৭	+১১
নাটোর	+৩	+৪	+৭
পাবনা	-২	+২	+১৩
সিরাজগঞ্জ	+১	+২	+৪
বগুড়া	+৪	+৫	+৪
নওগাঁ	+২	+৪	+৯
জয়পুরহাট	০	+২	+৮

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৮	+৭	+২
বাগেরহাট	+৭	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৯	+৮	+২
ফরিদপুর	+৭	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬
ঝিনাইদহ	+৫	+৬	+৪
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৬	+৭	+৭
মাগুরা	+৭	+৭	+৪
নড়াইল	+৫	+৫	+২

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-২	০	+৯
দিনাজপুর	০	+৩	+১১
গাইবান্ধা	-২	০	+৭
কুড়িগ্রাম	-৪	-১	+৭
লালমনিরহাট	-৩	০	+৯
নীলফামারী	-২	+১	+১১
পঞ্চগড়	-২	+২	+১৩
ঠাকুরগাঁও	+১	+৪	+১৩

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৪	-২	+২
শেরপুর	-৩	-১	+৪
জামালপুর	-১	০	+৪
নেত্রকোনা	-৬	-৪	+১

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-১০	-৮	-৩
সুনামগঞ্জ	-৮	-৬	-২
মৌলভীবাজার	-৮	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৭	-৫	-৩

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+২	+২	-২
পটুয়াখালী	+৪	+৩	-৩
পিরোজপুর	+৫	+৪	-১
ঝালকাঠি	+৪	+৩	-২
ভোলা	০	০	০
বরগুনা	+৬	+৪	-২

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مجلة الإعتصام الشهرية

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, জুলাই ২০২৬ইং,
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মুহাররম-সফর ১৪৪৮

www.al-itisam.com

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ
প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**

» **কুরআনের গভীরে**

বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসা: কুরআনের আলোকে এক চিরন্তন আখ্যান ৩
-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক

» **প্রবন্ধ**

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম ৮
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ ১২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

অন্ধ অনুসরণের বেড়াজালে ইসলাম ১৬
-আব্দুল গাফফার মাদানী

ইসলামে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৫
-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**

ঈমান ও নিরাপত্তা লাভ: পবিত্র জীবনের ভিত্তি ২৭

» **কুরআনের মর্মবাণী**

রবের বাণী ৩০
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

» **খুলুকুল মুসলিম**

উলামায়ে কেরামের সাথে একজন মুসলিমের আচরণ ৩১
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান

» **ফাযায়েলে আমল**

মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, বায়তুল মাক্বদিস ও মসজিদে কুবায় ছালাত আদায়ের ফযীলত ৩২
-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)

» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**

ছালাতে সুতরা ও তার সুন্নাতসমূহ ৩৩
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

» **সাময়িক প্রসঙ্গ**

বিশ্বকাপ ফুটবল: বিনোদনের আড়ালে ঈমান বিধ্বংসী সংস্কৃতি? ৩৪
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী

» **নারীদের পাতা**

ইসলামে নারীর হিজাবের বিধান ও তার যৌক্তিকতা ৩৬
-আয়েশা হুমায়রা

» **হেলথ কর্নার**

বর্ষায় বাড়ছে শিশুদের ডায়রিয়ার প্রকোপ: প্রয়োজন সচেতনতা ৪০
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ

» **কবিতা ॥ ৪২**

» **সংবাদ ॥ ৪৩**

» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৫**



সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ফুটবল বিশ্বকাপ উন্মাদনা: কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে মুসলিম উম্মাহ?

মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। মহান আল্লাহর অন্য সকল সৃষ্টির স্বাধীনতা অনেক সীমাবদ্ধ। পশু-প্রাণী থেকে শুরু করে ফেরেশতা পর্যন্ত সবাই মহান আল্লাহর নির্ধারিত একটি সীমার মধ্যেই চলাফেরা করে। শুধু মানুষকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত জ্ঞানও প্রদান করা হয়েছে। আর এই যোগ্যতার কারণে পৃথিবীর দায়িত্বও মানুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল কিছু মানুষের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। মানুষের জ্ঞান যেন তার স্বাধীনতাকে মহান আল্লাহর অনুগত রাখে এবং মানুষ যেন পৃথিবীর দায়িত্বশীল হিসেবে পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে—এটিই মহান আল্লাহর চাওয়া।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, শয়তান মানুষকে তার এই মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। মানুষের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যকে সামান্য বিনোদন ও খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চায়। যেন মানুষ অন্য পশু-প্রাণীর মতো পৃথিবীতে একটি সীমাবদ্ধ দাসের জীবনযাপন করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খাওয়া ও ফুর্তি করা ছাড়া তার আর কোনো করণীয় নেই। আর শয়তান তার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মানুষকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে রাখতে চায়। তাকে নেশা, জুয়া, খেল-তামাশা ইত্যাদিতে এমনভাবে উন্মত্ত করে ফেলে যে, মানুষ নিজের বিবেকবোধের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং মৃত্যু-পরবর্তী চিন্তা ভুলে যায়।

তবে শয়তানের এই প্রজেক্টে যুগে যুগে বাধা হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। যাঁরা মানুষকে শত বিনোদনের মধ্যেও পরকালের কথা স্মরণ করাতেন। মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য স্মরণ করাতেন। সেই ধারাবাহিকতায় এই দায়িত্ব এখন উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর একটি বড় অংশ আজ শয়তানের ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে নিজেকে ধরা দিয়েছে। যার অন্যতম জ্বলন্ত উদাহরণ ফুটবল বিশ্বকাপ।

খেলাধুলা ইসলামে অবশ্যই জায়েয। তবে খেলাধুলা কখনোই জীবনের উদ্দেশ্য বা জীবনের পেশা হতে পারে না। মানুষের দায়িত্ব খেলাধুলার চেয়েও অনেক মহৎ। খেলাধুলা কখনোই টাকা উপার্জনের মাধ্যম হতে পারে না। যে খেলায় শারীরিক কোনো পরিশ্রম নেই, সেগুলোও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর এই সকল হারামের উপস্থিতি থাকে বিশ্বকাপে। একদিকে খেলার প্রতি মুহূর্তের উপর চলে জুয়া ও বাজি। যেমন, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই প্রায় ২ কোটি ৫ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মোট ১.৮ বিলিয়ন ডলার বাজি ধরে থাকেন বলে American Gaming Association বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট শুরুর আগে অনুমান করেছে।

২০২৫ সালের মে মাসে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ—CID—অনলাইন জুয়া ও বেটিংয়ের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান শুরু করে। CID জানায়, জুয়ার লেনদেনে সম্পৃক্ততার প্রমাণসহ এক হাজারের বেশি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এজেন্ট শনাক্ত করা হয়েছে। সংস্থাটি আরও সতর্ক করেছে, সহজে অর্থ উপার্জনের আশায় অনেকে আসক্ত হয়ে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হচ্ছে; অপরাধ, পারিবারিক সহিংসতা এবং আত্মহত্যার মতো ঘটনাও ঘটছে।

একদিকে যেমন জুয়ায় আসক্ত যুবসমাজ, অন্যদিকে স্বাভাবিক দর্শক হিসেবেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা খেলা দেখতে ও খেলা নিয়ে অযথা তর্ক-বিতর্কে প্রচুর সময় নষ্ট করে থাকে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় স্ক্রিন লাগিয়ে ধুমধাম করে খেলা দেখার আয়োজন হয়ে থাকে। অথচ যারা আজকের বিশ্বের মোড়ল, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়—যেমন হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজে—এই ধরনের কোনো চিত্র দেখা যায় না। বরং ইয়াহূদী সমাজে এর উল্টো চিত্রই দেখা যায়।

বাকি অংশ ৫৬ নং পেজে...

www.al-itisam.com

কুরআনের গভীরে

বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর ভালোবাসা: কুরআনের আলোকে এক চিরন্তন আখ্যান

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক*

মানুষ যখন উপলব্ধি করতে পারে যে, তার প্রতিপালক তাকে কতখানি ভালোবাসেন, তখন তার অন্তরে এক অপূর্ব বোধ জাগ্রত হয়। জাহান্নামের ভয় কিংবা জান্নাতের লোভ—এই দুইয়ের ঊর্ধ্বে উঠে কেবল ভালোবাসার টানেই বান্দা তখন তার প্রভুর দিকে ফিরে আসতে চায়। তাই আজকের এই নিবন্ধে আমরা কুরআনুল কারীমের আলোকে অনুসন্ধান করব মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কতটুকু ভালোবাসেন, কেমনভাবে ভালোবাসেন।

কুরআনের যে আলোচনা সবচেয়ে দীর্ঘ:

কুরআন মাজীদ মানুষের হেদায়াতের জন্য নাযিল হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই কিতাবে ইসলামের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, কিছু বিধানের আলোচনা তিনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে করেছেন, আর কিছু বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বারবার তুলে ধরেছেন।

যেমন ছালাতের কথাই ধরা যাক। কুরআনে বহুবার এসেছে ‘আক্বীমুছ ছালাহ’ অর্থাৎ ‘ছালাত ক্বায়েম করো’। কিন্তু ছালাত কখন আদায় করতে হবে, কত ওয়াক্ত, কত রাকআত—এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কুরআনে নেই; বরং তা রাসূল ﷺ -এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যাকাতের ক্ষেত্রেও একই বিষয় দেখা যায়। হজ্জের তিন প্রকার—তামাত্তু, ইফরাদ ও কিরানের বিস্তারিত বিধানও কুরআনে উল্লেখ নেই। এসব বিধানের ব্যাখ্যা এসেছে রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ থেকে।

কিন্তু একটি বিষয় আছে, যা মহান আল্লাহ অসংখ্যবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ কুরআনে আলোচনা করেছেন। আর তা হলো মানবসৃষ্টির ইতিহাস, বিশেষত আদম আলাইহিস সালাম -এর সৃষ্টি এবং ইবলীসের সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথন। কুরআনের অন্তত ১১টি স্থানে এই ঘটনা এসেছে। কোথাও বলা হয়েছে মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কোথাও জমাট রক্ত থেকে, কোথাও শুক্রবিন্দু থেকে। কখনো সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপের কথা এসেছে, আবার কখনো এসেছে রূহ ফুঁকে দেওয়ার বিবরণ।

কিন্তু কেন কুরআনে বারবার মানুষের সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে? কেন প্রথমবার মানুষকে কীভাবে সৃষ্টি করা হলো এবং মায়ের গর্ভে তাকে কীভাবে গঠন করা হয় তা আল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন? পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যখন কোনো বিষয় বারবার উল্লেখ করেন, তখন তা নিশ্চয়ই সাধারণ কোনো বিষয় নয়।

পরিচয়: তুমি ‘মানুষ’ নও, তুমি ‘খলীফা’

কুরআনে প্রথম যেখানে মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রথম যে পরিচয় উল্লেখ করেছেন তা ছিল মানুষ যমীনে আল্লাহর প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ যখন মানব সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন ফেরেশতাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন,

‘আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’ *(আল-বাক্বারা, ২/৩০)*।

লক্ষ করুন, এখানে আল্লাহ ‘মানুষ’ বা ‘ইনসান’ শব্দ ব্যবহার করেননি, যদিও আরবীকে এ শব্দগুলো বিদ্যমান ছিল। তিনি বেছে নিয়েছেন একটি বিশেষ শব্দ ‘খলীফা’, যার অর্থ প্রতিনিধি। প্রতিনিধি কাকে বলে? যিনি তার মালিকের আদেশ বাস্তবায়ন করেন। কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবেছেন যে, আপনি আল্লাহর প্রতিনিধি? আচ্ছা, আমি প্রতিনিধি বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে বলি, মনে করুন! আপনাকে বর্তমান বাংলাদেশের কোনো একটি রাজনৈতিক দল তাদের কোনো বিষয়ে আপনাকে তাদের

১*ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত; বিএ (অনার্স), কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা, সঊদী আরব।

www.al-itisam.com

প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু আপনি যেই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সেই রাজনৈতিক দলেরই যদি বিরোধিতা করেন, তাদের নিয়ম ভায়োলেট করেন; তাহলে কি তারা আপনাকে তাদের প্রতিনিধি রাখবে? এখানে আরেকটি বিষয়, আপনি যার প্রতিনিধি হবেন তার মর্যাদার উপর ভিত্তি করে আপনার সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হবে, তাই নয় কি? এখন আপনি একটু ভাবুন! আপনি পৃথিবীর স্রষ্টার প্রতিনিধি, এই বিশ্ব জগতের যিনি মালিক তাঁর খলীফা। আপনি কি এটা একটু চোখ বন্ধ করে কল্পনা করবেন?

ফেরেশতাদের যুক্তিকে উপেক্ষা করে মানুষ সৃষ্টি:

আল্লাহর এই ঘোষণার পরই ফেরেশতারা প্রশ্ন করলেন,

'তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে (দুনিয়ায়) ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? অথচ আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি' *(আল-বাক্বারা, ২/৩০)*।

অর্থাৎ প্রতিনিধি করার মাধ্যমে আপনি যদি তার গোলামী বা দাসত্ব চান, তাহলে অমরা ফেরেশতারা তো সেটা করি কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন ছাড়া। এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ কী বললেন? তিনি সৃষ্টির কারণ বর্ণনা না করে শুধু বললেন,

'ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামূন' অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না' *(আল-বাক্বারা, ২/৩০)*।

সত্যি বলতে আমার কথা ভুল হতে পারে, তবে এই একটি বাক্যেই আমি যে রবের ভালোবাসার গভীরতা উপলব্ধি করেছি, তা হয়তো আপনাকে বুঝাতে পারব না। ফেরেশতাদের মতো নিষ্পাপ, নিরলস ইবাদতকারীর যুক্তিকে উপেক্ষা করে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

জ্ঞানের প্রতিযোগিতা: সম্মানের প্রথম মাপকাঠি

মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তারপর কি তিনি আদম আলাইহিস সালাম -কে এই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করলেন? অথবা ফেরেশতাদেরকে বললেন, আদম আলাইহিস সালাম এই পৃথিবীর এমন সৃষ্টি যাকে আমি এই পৃথিবীর সকল মূল্যবান সম্পদ দিয়ে দিয়েছি, সুতরাং সে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? আল্লাহ এসবের কিছুই বলেননি। বরং তিনি তাকে জ্ঞান দিলেন, এটাই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণ করার সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম। তিনি বলেন,

'আর তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে এদের নামসমূহ আমাকে বলে দাও। তারা বলল, আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই' *(আল-বাক্বারা, ২/৩১-৩২)*।

এখানে আরবী শব্দ 'আল-আসমা' ও 'কুল্লাহা' উভয়ই 'সমস্ত' ও 'সকল' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আদম আলাইহিস সালাম -কে আল্লাহ এমন কোনো জ্ঞান নাই, যা তাকে শেখাননি। আজ আমাদের ঘরে যে আলো জ্বলছে, যে পাখা ঘুরছে, আকাশে যে বিমান উড়ছে, যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি—এ সবকিছুর মূল ভিত্তি এবং এর পেছনের অন্তর্নিহিত জ্ঞান আল্লাহ সেদিন আদম আলাইহিস সালাম -কে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এরপর তিনি ফেরেশতাদের সামনে সবকিছু পেশ করলেন এবং বললেন, 'বলো, এদের নাম কী? তোমরা যদি জেনে থাক এগুলো কী, তাহলে সেগুলোর নাম বলো। তারা স্বীকার করলেন তাদের অজ্ঞতা। তারপর আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম -কে আদেশ দিলেন, 'হে আদম! তুমি বলে দাও'। আদম আলাইহিস সালাম এক এক করে সব নাম বলে দিলেন।

আমরা যদি একটু সাধারণভাবে দেখি, তাহলে ফেরেশতা ও আদম আলাইহিস সালাম -এর মাঝে নাম বলতে পারা বা না পারার বিষয়টি অনেকটা প্রতিযোগিতার মতো। যদি সাময়িকভাবে আমরা এটাকে প্রতিযোগিতা হিসেবে মেনে নিই, তাহলে এটিই পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতা এবং সেই প্রতিযোগিতা ছিল জ্ঞানের। আদম আলাইহিস সালাম -কে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন জ্ঞান দিয়ে। প্রতিযোগিতায় জয়ের মাধ্যমে আদম আলাইহিস সালাম -এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

এই সত্যটি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। আজ যদি কেউ পৃথিবীতে নেতৃত্ব দিতে চায়, যদি কোনো জাতি সম্মানিত হতে চায়, তাহলে তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। মুসলিম উম্মাহ যখন জ্ঞানের শীর্ষে ছিল, তখন তারা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছে। আজ যাদের হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাদের হাতেই বিশ্বনেতৃত্ব। কারণ সম্মানের প্রথম মাপকাঠি জ্ঞান।

সিজদা:

জ্ঞান দিয়ে সম্মানিত করার পর্ব শেষ হলে আল্লাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ আদেশ দিলেন,

'আর যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো, তখন তারা সিজদা করল; তবে ইবলীস ব্যতীত,

সে অস্বীকার করল ও অহংকার করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো' *(আল-বাক্বারা, ২/৩৪)*।

ইসলামের আগের সিজদা ও পরের সিজদা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না অথবা ফেরেশতাদের সিজদার হুকুম বিষয়েও আলোচনা করছি না, আমি শুধু এতটুকু বুঝানোর জন্য সামনের কথাগুলো বলব যে, সিজদা গুরুত্বপূর্ণ কিছু। সিজদার গুরুত্ব বুঝতে হলে কিছু কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে সবার আগে যে হিসাব নেওয়া হবে, তা হলো ছালাতের। ছালাত যার শুদ্ধ হবে, তার বাকি সব হিসাব পরিশুদ্ধ গণ্য হবে। সকল ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো ছালাত, আর ছালাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিজদা, যেখানে বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।

অন্যদিকে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক, যার অর্থ আল্লাহর ইবাদতে কাউকে অংশীদার করা। সুতরাং বলা যায় যে, ইবাদত যত বড় হবে এবং তা যখন অন্য কারও জন্য করা হবে, তখন সেটা শিরকের মধ্যে তত বড় শিরক।

যদিও এই সিজদা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিল না। তবে সেই সিজদা ছিল বাস্তবেই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই সিজদা ছিল সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

'যাকে আমি নিজে দুই হাতে সৃষ্টি করেছি':

সিজদার এই আদেশে ইবলীস অহংকার করল। সে আল্লাহর আদেশকে উপেক্ষা করল। সে ভাবল, সে তো আগুনের সৃষ্টি, সে কেন মাটির তৈরি আদমকে সিজদা করে সম্মান প্রদর্শন করবে? আল্লাহর আদেশকে লঙ্ঘন করে ধৃষ্টতা প্রদর্শনের পরে আল্লাহ চাইলে তখনই কোনো ফেরেশতাকে আদেশ দিতে পারতেন তাকে বিতাড়িত করতে, কিন্তু আল্লাহ তা করলেন না। কুরআনের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল কিছু মুহূর্ত আছে যেখানে মহান আল্লাহ সরাসরি কারো সঙ্গে কথা বলেছেন। যেমন তিনি মূসা ﷺ -এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সেই বিরল মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে আল্লাহ স্বয়ং কোনো মাধ্যম ছাড়া ইবলীসকে সম্বোধন করেছেন। আর এই কথোপকথনের কেন্দ্রবিন্দু কে? মানুষ!

'তিনি বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ দুই হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন?' *(ছোয়াদ, ৩৮/৭৫)*।

এখানে আরবী শব্দ 'বি-ইয়াদাইয়্যা' অর্থ 'আমার দুই হাতে'। আল্লাহ বলেননি, 'যাকে আমি সৃষ্টি করেছি'; তিনি বললেন, 'যাকে আমি আমার নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি'। পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টির সময় আল্লাহ শুধু বলেছিলেন, 'কুন' তথা 'হও'; আর তা হয়ে গেছে। কিন্তু আদম ﷺ -কে সৃষ্টি করার সময় তিনি বললেন, 'আমি নিজে আমার দুই হাত দিয়ে'। ইবলীস উত্তর দিল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মাটি থেকে'। এর জবাবে আল্লাহ ইবলীসকে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত করলেন। শুধু তা-ই নয়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার উপর লা'নত ঘোষণা করলেন। আমরা যতবার 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' পড়ি, এই 'রাজীম' অর্থই বিতাড়িত। ঠিক এই কারণেই তাকে বিতাড়িত বলা হয়, কারণ সে আদম ﷺ -কে সিজদা করেনি।

এটা কি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা? নাকি এর প্রতিটি স্তরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বান্দার প্রতি প্রতিপালকের সেই গভীর স্নেহ, যত্ন ও করুণা? আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বললেন, আদমকে সিজদা করতে এটা অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ইবলীস যখন সিজদা করল না, তখন আল্লাহ ইবলীসের সাথে কথা বললেন সিজদা না করার এই বিষয়টি নিয়ে, এটা অবশ্যই সাধারণ কিছু নয়। এরপর যেটা ঘটল আদম ﷺ -কে সিজদা না করার অপরাধে এবং অহংকার করে আল্লাহর আদেশ প্রত্যাখ্যান করার কারণে আল্লাহ তাকে চিরদিনের মতো তাড়িয়ে দিলেন। আল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি বের হয়ে যাও, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত', আরও বললেন, 'নিশ্চয় ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার অভিশাপ রইল তোমার উপর'। আজ অবধি আমরা মুসলিমরা ইবলীসকে বিতাড়িত শয়তান হিসেবে তাকে অভিশাপ দেই।

কিন্তু বিশাল এই ঘটনাপ্রবাহে আদম ﷺ -এর সন্তান হিসেবে আমার-আপনার কি কখনও এ অনুভূতি জেগেছে যে, আদম সন্তানের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে? আপনার পূর্বপুরুষকে কেউ সিজদা না করার কারণে আল্লাহ নিজেই তার সঙ্গে কথা বলেছেন।

এই ঘটনায় যে দিকটি আদম ﷺ -এর প্রতি আল্লাহর স্নেহ ও মর্যাদাকে আরও গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলে, তা হলো আল্লাহ ইবলীসকে বলছেন, তুমি যাকে সিজদা করনি, সে তো সাধারণ কেউ নয়; সে এক অসাধারণ সৃষ্টি। তবে তার অসাধারণত্ব এ কারণে নয় যে, তার অনেক শক্তি রয়েছে কিংবা তাকে অগাধ সম্পদ দেওয়া হয়েছে; বরং তার মর্যাদার কারণ হলো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন।

www.al-itisam.com

ইবলীসের চ্যালেঞ্জ ও আল্লাহর উত্তর:

বিতাড়িত হওয়ার পর ইবলীস আল্লাহকে এক ভয়ংকর প্রতিজ্ঞা শোনাল,

'সে বলল, আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকব। তারপর আমি অবশ্যই তাদের নিকট আসব তাদের সম্মুখ থেকে, তাদের পশ্চাৎ থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৬-১৭)*।

ইবলীস আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সে শপথ করল, আদম সন্তানের ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথে ওত পেতে বসে থাকবে; ফজরের ছালাতের পথে, রামাযানের ছিয়ামের পথে, দানের পথে, ইবাদতের প্রতিটি পথে। চারদিক থেকে সে আদম সন্তানকে বাধা দেবে, যেন তারা কোনো ভালো কাজ করতে না পারে।

কিন্তু ইবলীসের এই যুদ্ধ ঘোষণার বিপরীতে আল্লাহ কী বললেন? তিনি এমন কথাই বললেন, যা একজন মালিক তার বিশ্বস্ত বান্দা সম্পর্কে বলতে পারেন। কারণ তিনি তাঁর বান্দার প্রতি আস্থা রাখেন। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, ইবলীস কখনোই তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। তিনি ইবলীসকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিলেন এবং পাল্টা বললেন,

'নিশ্চয়ই আমার (নিষ্ঠাবান) বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা থাকবে না; পথভ্রষ্টদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদের কথা ভিন্ন' *(আল-হিজর, ১৫/৪২)*।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল্লাহ এখানে 'নেককার বান্দা' কিংবা 'মুত্তাক্বী বান্দা' বলেননি; বরং বলেছেন, 'আমার বান্দা'। অর্থাৎ যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে নিজেদের রব হিসেবে মেনে নেয়, যারা অন্তর থেকে নিজেকে তাঁর গোলাম ও অনুগত বান্দা মনে করে, ইবলীস তাদের পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না।

ইবলীসের সঙ্গে এক প্লেটে?

এই সমস্ত আলোচনার পর এক করুণ বাস্তবতা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। যাদের কারণে আল্লাহ ইবলীসকে বিতাড়িত করলেন, যাদের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার উপর লা'নত নাযিল হলো, আজ আমরা কার কথা শুনছি?

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এমন কিছু মুহূর্ত এসেছে, যখন আমরা ফজরের আযানের পরও বিছানায় শুয়ে থেকেছি, রামাযানে ছিয়াম ভঙ্গ করেছি, কাজের অজুহাতে ছালাত পরিত্যাগ করেছি, কিংবা পরনারীর মোহে বিভ্রান্ত হয়েছি। সেই মুহূর্তগুলোতে আমরা আসলে কার আনুগত্য করেছি? সেই ইবলীসের, যে আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম -কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল।

একটু কল্পনা করুন, কেউ যদি আপনার বাবাকে অপমান করে, আপনি কি তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেতে পারবেন? কেউ যদি আপনার সন্তানের গায়ে হাত তোলে, আপনি কি তাকে সহজে মেনে নিতে পারবেন? কেউ যদি আপনার মানসম্মান ক্ষুণ্ন করে, আপনার আত্মমর্যাদা কি তা মেনে নেবে? কখনোই না।

তাহলে সেই ইবলীস, যে আদম সন্তানকে সিজদা করতে অস্বীকার করার কারণেই আজ চিরবিতাড়িত, তার ডাকে সাড়া দিয়ে ছালাত ছেড়ে দেওয়া, তার প্ররোচনায় গুনাহে লিপ্ত হওয়া— এসব কি আমাদের সম্মান ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে মানানসই? এসব কি আমাদের প্রভুর প্রতি সামান্যতম কৃতজ্ঞতার পরিচয় বহন করে?

'নিশ্চয় আমি অতি নিকটে':

আমরা নিজের আত্মসম্মান ও মর্যাদা ভুলে সেই ইবলীসের আনুগত্য করেছি। পাপে লিপ্ত হয়েছি। কিন্তু আমাদের পাপের পাহাড়সম অপরাধ সত্ত্বেও আল্লাহ কি আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তিনি কি রাগান্বিত হয়ে বলেছেন, যাহ! আমি তোদেরকে একেবারেই জাহান্নামে দিয়ে দিলাম? না, কখনোই না। তিনি আমাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেননি। বরং তাঁর এই নগণ্য বান্দাদের জন্য ক্ষমা ও তওবার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। সেই আল্লাহ একটি বিস্ময়কর আয়াত নাযিল করেছেন,

'আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দাও) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৬)*।

আয়াতের গভীরতা অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে একটু কুরআনের অন্য কিছু আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে করা কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। যেমন- যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে 'খমর' বা নেশাদার দ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখন আল্লাহ

www.al-itisam.com

তাআলা বলেছেন, হে নবী! আপনি বলে দিন। যখন হারাম মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখন আল্লাহ আবার একইভাবে বলেছেন, হে নবী! আপনি বলে দিন যে বিষয়টি এই রকম। কুরআনে প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বাক্যের প্যাটার্ন অনেকটা একই রকম যে 'হে নবী! আপনি বলে দিন বিষয়টি এই রকম। শুধু একটি স্থানে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে সেটি হচ্ছে উপরে উল্লেখকৃত আয়াতে। যখন বান্দা আল্লাহর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে, তখন তিনি বলেননি, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো'; বরং তিনি সরাসরি বললেন, 'ফা-ইন্নী ক্বারীব' অর্থাৎ নিশ্চয় আমি (অতি) নিকটে। যেন বিষয়টি অনেকটা এই রকম যে, যখন আমার বান্দা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে তখন আমি নিজেই বলছি যে, আমি আমার বান্দার নিকটে আছি, সে আমার কাছে যা চাইবে আমি সেটা তাকে দিব। বিষয়টি এই রকম যে, মাঝখানে কোনো জিবরীল নেই, কোনো রাসূল নেই, শুধু আল্লাহ আর তাঁর বান্দা।

উপরের বিষয়টি আমাদের আরও গভীরভাবে উপলব্ধি হবে, যদি আমরা এই হাদীছটি পড়ি ও বুঝার চেষ্টা করি, যেখানে রাসূল ﷺ বলেছেন,

'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কে আছে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব; কে আছে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব; কে আছে আমার কাছে চাইবে? আমি তাকে দান করব'।[২]

মা ও সন্তান: একটি হৃদয়স্পর্শী হাদীছ

ছহীহ বুখারীতে উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু এক অসাধারণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার নবী ﷺ-এর সামনে কিছু যুদ্ধবন্দি আনা হলো। তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিল, যার স্তন দুধে পূর্ণ এবং বন্দিদের মধ্যে যে কোনো শিশু পেলেই সে তাকে বুকে জড়িয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিল, সম্ভবত তার নিজের সন্তানকে সে হারিয়ে ফেলেছিল। নবীজি ছাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কী মনে কর, এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে?' ছাহাবীরা বললেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষমতা থাকলেও সে কখনো করবে না। তখন রাসূল ﷺ বললেন,

'এ স্ত্রীলোকটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর তার চেয়েও অধিক দয়ালু'।[৩]

ভাবুন তো, আপনি আপনার সন্তানের সামান্য জ্বরে অস্থির হয়ে যান, তার একটু কষ্টও সইতে পারেন না, আপনার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করার কথা কল্পনা করতেও আপনার শিরা কেঁপে ওঠে; আর সেই আপনার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা সেই মায়ের ভালোবাসার চেয়েও বহুগুণ বেশি!

কল্পনা করুন, আপনি বিমানে উড়ছেন। হঠাৎ ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেল, বিমান নিচে নামতে শুরু করল, মাটির খুব কাছে এসে আবার ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। আপনি কতখানি আনন্দিত হবেন? রাসূল ﷺ বলেছেন,

'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তার চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যতখানি তোমাদের মধ্যে কেউ মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পেলে আনন্দিত হয়'।[৪]

আল্লাহ আপনার তওবায় খুশি হন! আপনার ফিরে আসায় তিনি আনন্দিত হন! এই তো সেই প্রতিপালক, যিনি কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বলেছেন,

'হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেন' *(আয-যুমার, ৩৯/৫৩)*।

উপসংহার:

আসুন, আমরা আল্লাহর ভালোবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে। যেহেতু আমাদের কারণেই আল্লাহ ইবলীসকে বিতাড়িত করেছিলেন, আমাদের কারণেই ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার উপর লা'নত নাযিল হয়েছে, আজ থেকে অন্তত এই শপথ হোক যে, আমরা আর সেই ইবলীসের আনুগত্য করব না। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ছালাত ত্যাগ করব না, ছিয়াম ভঙ্গ করব না, পাপের পথে পা বাড়াব না।

আমাদের প্রতিপালক আমাদের ভালোবাসেন। তিনি কেবল জাহান্নামের ভয়ই দেখাননি; বরং প্রতিটি স্তরে, খলীফা সৃষ্টিতে, জ্ঞান শিক্ষায়, প্রতিযোগিতার আয়োজনে, সিজদার আদেশে, ইবলীসের সঙ্গে কথোপকথনে এবং ক্ষমার আহ্বানে আল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের কতখানি ভালোবাসেন। এই ভালোবাসা অনুধাবন করেই বান্দার উচিত তার রবের দিকে ফিরে আসা।

আল্লাহ আমাদের সকলকে ইবলীসের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করুন, তাঁর ভালোবাসা অনুধাবনের তাওফীক্ব দান করুন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত আদায় করার এবং হক্বের পথে অবিচল থাকার শক্তি দিন- আমীন!

২. ছহীহ বুখারী, হা/১১৪৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৮।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৯৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৫৪।
৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৪৭।

www.al-itisam.com

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম

মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা'দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-৩)

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

মুসলিম জামা'আত বিষয়ে বিভিন্ন ফেরকা ও মাযহাবের অবস্থান

আমি বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ ও দলগুলোর উৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেছি এবং দেখেছি, এগুলোর প্রতিটিই নবী ﷺ এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশিদীনের رضي الله عنهم স্বর্ণযুগের অনেক পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে— সেগুলো যেমন দলই হোক-না কেনো।

এই দলগুলো মূলত কয়েক ধরনের হতে পারে:

রাজনৈতিক: যেগুলো ধর্মের আবরণ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন: শী'আ ও খাওয়ারিজ।

আক্বীদাগত: যেমন: ক্বদারিয়া, মুরজিআ, মু'তাযিলা, আশ'আরিয়া এবং মাতুরিদিয়া।

মাসলাকগত: যেমন: ছূফীবাদ এবং এর বিচিত্র শাখা-প্রশাখা ও দল-উপদল।

শাখা-মাসআলাগত: যেমন: হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বালী ও যাহেরী মাযহাবের অন্ধ অনুসারীবৃন্দ।

এসব পর্যবেক্ষণ থেকে আমি এই সত্যটি উপলব্ধি করেছি যে, ইসলামের সূচনালগ্নে (اَلصَّدْرُ الْأَوَّلُ) যারা যথাযথভাবে শাহাদাতাইন (কালিমাদ্বয়) পাঠ করেছেন, তারা পূর্ণাঙ্গ মুসলিম এবং তাদের পরিচয়ের জন্য এটিই ছিল যথেষ্ট। তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রিত এবং 'জামা'আতে মুসলিমীন'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সুতরাং একজন মুসলিমের সাথে অন্য মুসলিমের আক্বীদা, মাসআলা, তরীকা কিংবা রাজনীতির ভিত্তিতে কোনো বিভেদ নেই। বরং সবাই মিলে এক 'উম্মাতে ইসলাম'। তাদের বিশ্বাস এক, কিবলা এক; তারা অভিন্ন শারঈ বিধানের অনুসারী এবং এক সাধারণ রাষ্ট্রনীতির অধীনে ঐক্যবদ্ধ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ এভাবেই অতিবাহিত হয়েছিল, যেখানে কোনো বিক্ষিপ্ততা, বিভেদ, দলাদলি বা বিচ্ছিন্নতা ছিল না। যখনই কোনো ফেতনা বা বিশৃঙ্খলার উদ্রেক হয়েছে, তখনই তা অঙ্কুরেই অবদমিত হয়েছে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় বড় বড় ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। তখনই আত্মপ্রকাশ করে বিভিন্ন দল ও উপদল। এগুলোর প্রতিটিই উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে অনৈক্য ও বিভাজনকে ত্বরান্বিত করেছে। আর এই বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে মুসলিম জামা'আতের ভেতরে তাদের পারস্পরিক দয়া ও হৃদ্যতার পরিবেশ বিদায় নেওয়ার পর।

এই বিভাজনের মূলে কাজ করেছে আক্বীদাগত, রাজনৈতিক এবং তরীকাগত বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা। বিষয়টি যেকোনো গবেষক বা পর্যবেক্ষণকারীর কাছে স্পষ্ট।

আর শাখা-মাসআলাগত বিষয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ অনুসারীর মাঝে চরম গোঁড়ামি ও অন্ধ দলপ্রীতি কাজ করেছে। অথচ এটি চার ইমামের رحمهم الله ভুল ছিল না; বরং প্রত্যেক ইমামই তাঁর অন্ধ অনুকরণ (তাক্বলীদ) করতে নিষেধ করেছেন এবং সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে ও ব্যক্তিমতকে বর্জন করতে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

বস্তুত এই চার ইমাম এবং তাদের পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি উম্মাহর বিজ্ঞ আলেমগণই হলেন আল্লাহ কর্তৃক দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম মাধ্যম। আর আমলদার আলেমদের দোষারোপ

৫* বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

www.al-itisam.com

করা তো প্রকাশ্য গোমরাহি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু যারা শাখা-মাসআলাগত ক্ষেত্রে মাযহাবের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছে এবং গোঁড়ামির আগুনে পুড়েছে, তারাই তাঁদের অধিকারের ক্ষেত্রে ভুল করেছে এবং তাঁদের বিরোধিতা করেছে। এভাবেই তাদের কারণে নানা ফেতনা সংঘটিত হয়েছে, উম্মাহর তেজ ও শক্তি বিনষ্ট হয়েছে, মেধা ও শ্রম অপচয় হয়েছে এবং শুরু হয়েছে নানামুখী বাকযুদ্ধ।

এমনকি অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দ্বীনের নামে এমন সব প্রথা অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে, যা বিভেদ ও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন: হানাফী ও শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম বলে ফতওয়া দেওয়া কিংবা একে অপরের পেছনে ছালাত পড়াকে বাতিল ঘোষণা করা।

শুধু তাই নয়, ইতিহাস সাক্ষী যে, ইস্পাহান ও রায়-এর মতো প্রাচ্যের জনপদগুলোতে হানাফী ও শাফেঈদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে— যার বিবরণ 'মু'জামুল বুলদান' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

এভাবেই ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হয়েছে, যা মূলত সংকীর্ণমনা ও অন্ধ অনুসারীদেরই সৃষ্টি। ইসলাম এই অন্ধ গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং আমাদের সালাফে ছালেহীনও এই মাযহাবী গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

শাখা-মাসআলাগত বিষয়ে হাফেয ইবনু আব্দিল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْتَحِنَ النَّاسَ بِهَا، وَلَا يُوَالِيَ عَلَيْهَا، وَلَا يُعَادِيَ عَلَيْهَا، بَلْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ -مِنْ أَيِّ طَائِفَةٍ كَانَ-

'কারো জন্যই এটি সংগত নয় যে, সে এগুলোর মাধ্যমে তথা মাযহাবী ইস্যুর মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করবে, কিংবা এসব নামের ভিত্তিতে কারো সাথে মিত্রতা করবে কিংবা শত্রুতা পোষণ করবে। বরং আল্লাহর নিকট সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত তো সেই ব্যক্তি, যে তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু— সে যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হোক-না কেনো'।[৬]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুসলিম জামা'আত তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর সামনে বিভিন্ন ফেরকার পতন

আক্বীদাগত, তরীকাগত কিংবা রাজনৈতিক— এই সমস্ত ফেরকা বা দল মুসলিম জামা'আত তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর সুদৃঢ় অবস্থানের সামনে শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়; যারা নবুঅতের মানহাজ বা পথের ওপর অটল ছিলেন। তারা এক মুহূর্তের জন্যও এই মূলধারা থেকে বিচ্যুত হননি এবং কোনো বিশেষ নামেও নিজেদের চিহ্নিত করেননি। নবী ﷺ এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো পরিচয় তাদের নেই।

কিতাব ও সুন্নাহ তথা নবুঅতের মানহাজ ছাড়া তাদের অন্য কোনো স্বতন্ত্র মূলনীতি নেই। সাধারণ মুসলিমদের জামা'আত ছাড়া তাদের আলাদা কোনো দল নেই। কারণ, মূলধারার জন্য কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয় না; বরং যারা এই মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন উপদল সৃষ্টি করে, তাদের জন্যই স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন পড়ে।

ছহীহ হাদীছে এসেছে, যা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، فَادْعُوا بِدَعْوَةِ اللهِ الَّتِي سَمَّاكُمُ اللهُ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللهِ.

'যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের জ্বালানি হবে। এক ব্যক্তি বললেন, যদিও সে ছওম রাখে ও ছলাত পড়ে। তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, যদিও সে ছওম রাখে ও ছলাত পড়ে। অতএব, তোমরা মানুষকে সেই নামেই ডাকো, যে নামে আল্লাহ তোমাদের অভিহিত করেছেন: 'মুসলিম', 'মুমিন' এবং 'আল্লাহর বান্দা'।[৭]

অতএব, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত হলো ইসলামের সেই স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ রূপের অবিচ্ছিন্ন ধারা এবং তারা হচ্ছে মুসলিমদের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। আর এজন্যই যখন জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আবু আব্দিল্লাহ! আমি আপনাকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে

৬. ইবনু আব্দিল বার, আল-ইনতিক্বা, পৃ. ৩৫।

৭. নাসাঈ, সুনানে কুবরা, হা/৮৮১৫; বায়হাক্বী, সুনানে কুবরা, হা/১৬৬১৩।

www.al-itisam.com

চাই, আমি আপনাকে আমার ও আল্লাহর মাঝে দলীল হিসেবে রাখতে চাই’। তখন ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বললেন, ‘আল্লাহর তাওফীক্ব ছাড়া কোনো শক্তি নেই, আপনি জিজ্ঞেস করুন’। লোকটি বললেন, مَنْ أَهْلُ السُّنَّةِ؟ ‘আহলুস সুন্নাহ কারা?’ তিনি উত্তর দিলেন, أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ لَقَبٌ يُعْرَفُوْنَ بِهِ لَا جَهْمِيٌّ وَلَا قَدَرِيٌّ وَلَا رَافِضِيٌّ ‘আহলুস সুন্নাহ হলো তারা, যাদের চেনার জন্য আলাদা কোনো উপাধি নেই; তারা জাহমী নয়, ক্বদারী নয় এবং রাফেযীও নয়’।[৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, “তেমনিভাবে উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার আদেশ করেননি, এমন বিষয় দিয়ে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলাও বর্জনীয়। যেমন কাউকে ‘তুমি শাকীলী বা তুমি কারকান্দী’[৯] বলা। এগুলো সব বাতিল নাম, যেগুলোর স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। আল্লাহ প্রেরিত কিতাবে, তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহতে এবং সালাফে ছালেহীনের সুবিদিত কোনো আছারে ‘শাকীলী’ বা ‘কারকান্দী’ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

সুতরাং কোনো মুসলিমকে যখন এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন তার জন্য এভাবে জবাব দেওয়া আবশ্যক যে, لَا أَنَا شَكِيْلِيٌّ وَلَا قَرْقَنْدِيٌّ، بَلْ أَنَا مُسْلِمٌ مُتَّبِعٌ لِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ ‘আমি শাকীলীও নই, কারকান্দীও নই; বরং আমি একজন মুসলিম, যে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহর অনুসারী’।

মু‘আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে, একবার তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَنْتَ عَلَى مِلَّةِ عَلِيٍّ أَوْ مِلَّةِ عُثْمَانَ؟ আপনি কি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মিল্লাতের (আদর্শের) ওপর আছেন নাকি উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মিল্লাতের ওপর? ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উত্তরে বলেন, لَسْتُ عَلَى مِلَّةِ عَلِيٍّ وَلَا عَلَى مِلَّةِ عُثْمَانَ، بَلْ أَنَا عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ‘আমি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মিল্লাতের ওপরও নেই, উছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মিল্লাতের ওপরও নেই; বরং আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিল্লাতের ওপর আছি’।

সালাফগণ এভাবেই বলতেন, ‘এই সমস্ত প্রবৃত্তি ও মনগড়া মতবাদই হলো জাহান্নামের পথ’।

৮. ইবনু আব্দিল বার, আল-ইনতিক্বা, পৃ. ৩৫।
৯. এগুলো তৎকালীন রাজনৈতিক বা গোষ্ঠীগত পরিচয়।- অনুবাদক

তাদের মধ্যে একজন বলতেন, ‘আল্লাহ আমাকে যে দু’টি নেয়ামত দান করেছেন, তার মধ্যে কোনটি বড় তা আমি জানি না— তিনি আমাকে ইসলামের হেদায়াত দিয়েছেন সেটা বড়, নাকি আমাকে এই প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন সেটা বড়?

আল্লাহ তাআলা কুরআনে আমাদের নামকরণ করেছেন: ‘মুসলিম, মুমিন, আল্লাহর বান্দা’। সুতরাং আমরা সেসব নাম থেকে বিমুখ হবো না, যেগুলো দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ আমাদের নামকরণ করেছেন এবং এর পরিবর্তে এমন সব নতুন নামের দিকে ধাবিত হবো না, যা একদল লোক এবং তাদের পিতৃপুরুষরা উদ্ভাবন করেছে, যার স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।

সুতরাং কারো জন্যই এটি সংগত নয় যে, সে এসব নামের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করবে, কিংবা এসব নামের ভিত্তিতে কারো সাথে মিত্রতা করবে অথবা শত্রুতা পোষণ করবে। বরং আল্লাহর নিকট সৃষ্টির মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত তো সেই ব্যক্তি, যে তাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু— সে যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হোক-না কেনো।

আল্লাহর ওলি বা বন্ধু তো তারা, যারা ঈমান এনেছেন এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছেন। মহান আল্লাহ যথার্থ বলেছেন, ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ‘মনে রেখো, যারা আল্লাহর ওলি, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না’ (ইউনুস, ১০/৬২)।

আল্লাহ তাআলা মুত্তাক্বীদের পরিচয় স্পষ্ট করে বলেন,

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

‘ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হলো যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও

www.al-itisam.com

যাচ্ঞাকারীদেরকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে ছালাত ক্বায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাক্বী’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭৭)*।

বস্তুত তাক্বওয়া হলো, আল্লাহর নির্দেশসমূহ পালন করা এবং তাঁর নিষেধসমূহ বর্জন করা” (ইবনু তায়মিয়ার উদ্ধৃতি সমাপ্ত)।

অতএব, ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও তাকওয়া ছাড়া তাদের অন্য কোনো উপাধি নেই, যার দিকে তারা নিজেদের সম্বন্ধিত করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

‘আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন আর তোমরা মানুষের জন্য সাক্ষী হও’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৭৮)*।

মানুষদের জন্য সাক্ষী হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, তারা পথভ্রষ্টকারী ও কুফরী বিদ‘আতগুলো থেকে পূত-পবিত্র। যে বিদ‘আতী ব্যক্তি তার বিদ‘আতের কারণে কাফের হয়ে যায়, সে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তার বিদ‘আত ইসলামের অংশ নয়। যেমন বাতেনী ফেরকাসমূহ।

পক্ষান্তরে, যে বিদ‘আতী ব্যক্তি পথভ্রষ্ট (কিন্তু কাফের নয়), সে একদিক থেকে মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্যদিক থেকে সে তার বিদ‘আতের কারণে তাদের বিশুদ্ধতার ওপর নেই। কারণ ইসলাম এই সমস্ত বিদ‘আত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

বিভাজন ও বিচ্ছিন্নতার বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার আগে মুসলিমদের তথা ছাহাবীদের স্বতন্ত্র কোনো নাম ছিল না, যা দিয়ে তাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন হতো। কারণ, ইতঃপূর্বে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে— তারা ছিলেন ইসলামের মূল প্রতিচ্ছবি। কিন্তু যখন সেই সমস্ত পথভ্রষ্ট ফেরকার উৎপত্তি ঘটল, তখন পথভ্রষ্টদের জন্য বিভিন্ন উপাধি ব্যবহৃত হতে শুরু করল। যেমন:

আহলুল আহওয়া (প্রবৃত্তিপূজারি): কারণ তাদের ওপর প্রবৃত্তির তাড়না প্রবল ছিল।

আহলুল বিদ‘আ (বিদ‘আতী): কারণ তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত নতুন সব মতবাদ অনুসরণ করেছিল।

আহলুশ শুবুহাত (সংশয়বাদী): কারণ তারা সাধারণ মানুষের সামনে সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সংশয় সৃষ্টি করেছিল, যাতে করে সুন্নাহর পথ থেকে তাদের বিচ্যুত করা যায়। এই কাজে তাদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক হলো ইবলীস -তার উপর আল্লাহর লা‘নত হোক-, যে সর্বপ্রথম দ্বীনি বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত সংশয় সৃষ্টি করেছিল এবং বলেছিল, ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ‘আমি তার (আদম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১২)*।

যখন এই সমস্ত ফেরকা ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের প্রকাশ করল, তখন মুসলিম জামা‘আতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এবং এই সমস্ত ফেরকা ও প্রবৃত্তি পূজারীদের থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্য শরী‘আতসম্মত কিছু উপাধির আবির্ভাব ঘটল। এর মধ্যে কিছু নাম সরাসরি শরী‘আতের মূল উৎস থেকে প্রমাণিত। যেমন:

- আল-জামা‘আত।
- জামা‘আতুল মুসলিমীন।
- আল-ফেরকাতুন নাজিয়াহ (নাজাতপ্রাপ্ত দল)।
- আত-তায়েফাতুল মানছূরাহ (সাহায্যপ্রাপ্ত দল)।

আবার বিদ‘আতীদের সামনে তাদের সুন্নাহর প্রতি অবিচলতার কারণে তারা ইসলামের স্বর্ণযুগের সাথে সুদৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত। সেজন্যই তাদেরকে বলা হয়,

- আস-সালাফ (পূর্বসূরি)।
- আহলুল হাদীছ।
- আহলুল আছার।
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

www.al-itisam.com

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী-১৫তম পর্ব)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ البَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ البَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ المسَيِّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

৬৪. ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: ইসমাঈল ইবনু আব্দুল্লাহ আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে ইবরাহীম ইবনু সা'দ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি ছালেহ থেকে, তিনি ইবনু শিহাব থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা তাকে সংবাদ দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার সন্ধি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নিকটে ইসলামের লিখিত দাওয়াত পাঠাতে শুরু করেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি একটি চিঠি পারস্য সম্রাট কিসরার উদ্দেশ্যে লেখেন। তিনি তার একজন ছাহাবীকে এই চিঠি বাহরাইনের শাসকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, যেন বাহরাইনের শাসক সেই চিঠিটি কিসরার কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাহরাইনের শাসক যখন চিঠিটি কিসরার কাছে পৌঁছে দিলেন এবং কিসরা যখন চিঠিটি পড়ল, তখন সে তা ছিঁড়ে ফেলল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, ইবনুল মুসাইয়িব বলেছেন, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিসরার উপর বদদু'আ করে বললেন, 'তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়'। অর্থাৎ যেমন তারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছে, তেমনি তাদের সাম্রাজ্যও যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

অধ্যায় ও হাদীছের সাথে সম্পর্ক:

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লা-হ এই হাদীছটি এমন এক অধ্যায়ে এনেছেন, যেখানে মূলত দুটি বিষয় বোঝানো হয়েছে।

প্রথম বিষয়: লিখিত বার্তা বহন করা বৈধ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দূতের হাতে চিঠি দিলেন এবং তাকে বাহরাইনের শাসকের কাছে পাঠালেন। দূত নিজে হয়তো চিঠির ভেতরের সব কথা পড়েননি বা শুনেননি; কিন্তু তিনি জানতেন যে, এটি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চিঠি। তাই তিনি সেটি যথাযথভাবে পৌঁছে দিলেন। এতে বোঝা যায়, কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি লিখিত বার্তা বহন করতে পারে, যদিও সে বার্তার সব বিস্তারিত বিষয় নিজে না-ও জানে।

দ্বিতীয় বিষয়: লিখিত বার্তা থেকে জ্ঞান ও দলীল গ্রহণ বৈধ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শুধু মৌখিকভাবে দাওয়াত দেননি; বরং লিখিত চিঠির মাধ্যমেও রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও হাদীছ লিখিতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো বৈধ তথা মুনাওয়ালা জায়েয। বই, চিঠি, পত্রিকা, দাওয়াতী লিফলেট, লিখিত ফতওয়া, রাষ্ট্রীয় বার্তা এসবই দাওয়াত ও জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার বৈধ মাধ্যম হতে পারে।

রাবীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

এই হাদীছের সনদে মোট ছয়জন রাবী রয়েছেন। তাদের সকলেরই বিস্তারিত পরিচয় ইতঃপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আমরা শুধু তাদের পূর্ণ নাম উল্লেখ করলাম।

১. ইসমাঈল ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আবী উয়াইস আল-মাদানী।

২. ইবরাহীম ইবনু সা'দ। তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আওফ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বংশধর।

৩. ছালেহ ইবনু কায়সান আল-মাদানী।

৪. বিখ্যাত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব আয-যুহরী রহিমাহুল্লা-হ।

৫. উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা, তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ সাত ফক্বীহের একজন।

৬. বিখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা।

সনদের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য:

এই হাদীছের সনদে কয়েকটি لطائف বা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) হাদীছে বর্ণনার শব্দের ধরনে বিভিন্নতা আছে। সনদে এসেছে-

১০* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

www.al-itisam.com

حدّثنا (হাদ্দাছানা) তিনি আমাদেরকে হাদীছ শুনিয়েছেন।

حدّثني (হাদ্দাছানি) তিনি আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

عن (আন) অমুক থেকে।

أخبره (আখবারাহু) তিনি তাকে সংবাদ দিয়েছেন।

এতে বোঝা যায়, মুহাদ্দিছগণ হাদীছ গ্রহণ ও বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করতেন।

(২) সব রাবী মাদানী তথা এই সনদের রাবীগণ সবাই মদীনার অধিবাসী।

(৩) তাবেঈ থেকে তাবেঈর বর্ণনা আছে।

এই সনদে একজন তাবেঈ আরেকজন তাবেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনু শিহাব আয-যুহরী রহিমাহুল্লাহ নিজে একজন তাবেঈ, তিনি এই হাদীছে আরেক তাবেঈ উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ:

البحرين- এখানে বাহরাইন বলতে শুধু বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র বাহরাইন উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীনকালে বাহরাইন ছিল একটি বিস্তৃত অঞ্চল, যা বাছরা ও ওমানের মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

كِسْرَى- কিসরা হলো পারস্য সম্রাটদের উপাধি। যেমন রোমের সম্রাটদের বলা হতো قَيْصَر (কায়ছার)। কায়ছার শব্দটি রোমান বাদশাহ জুলিয়াস সিজারের নাম থেকে গৃহীত। তেমনি পারস্য সম্রাটদের বলা হতো كِسْرَى (কিসরা)। এটি মূলত পারস্য সম্রাট খসরু (خسرو) শব্দ থেকে আরবীতে গৃহীত।

কিছু প্রশ্ন ও ফিক্বহী ব্যাখ্যা:

‘আমার ধারণা’ দ্বারা কে উদ্দেশ্য?

فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ ‘আমার ধারণা, ইবনুল মুসাইয়িব বলেছেন’। এখানে فحسبت কথাটির বক্তা হলেন ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরী রহিমাহুল্লাহ। তিনি বলছেন, ‘আমার ধারণা, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেছেন...’।

এটি মূলত হাদীছ বর্ণনায় মুহাদ্দিছদের সতর্কতা। যেখানে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, সেখানে নিশ্চিত ভাষা বলেছেন আর যেখানে সামান্য সন্দেহ ছিল, সেখানে বলেছেন, فحسبت অর্থাৎ ‘আমার ধারণা’।

رَجُلًا বা একজন ব্যক্তি দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?

হাদীছে বলা হয়েছে, بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا ‘তিনি তাঁর চিঠিসহ একজন ব্যক্তিকে পাঠালেন’। এই ব্যক্তি হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ আস-সাহমী রাযিয়াল্লাহু আনহু। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ যখন মাগাযী অধ্যায়ে এই হাদীছ নিয়ে এসেছেন, তখন তার নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের একজন এবং প্রথম দিকের মুহাজির ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে রসিকতাপ্রবণ স্বভাবও ছিল। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে?’ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, أَبُوكَ حُذَافَةُ ‘তোমার পিতা হুযাফাহ’।

তারপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, ‘আমাকে আরও প্রশ্ন করো’। তখন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে বললেন, মহান আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মেনে এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবী হিসেবে মেনে আমরা সন্তুষ্ট।

এই ছাহাবীর সাথে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে আরও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ আস-সাহমী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনের এই ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম একটি বীরত্বগাথা এবং আত্মমর্যাদার এক অনন্য দলীল। এটি মূলত হিজরী ১৯ সনে (কারো মতে, হিজরী ২৩ সনে) আমীরুল মুমিনীন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের সময় ঘটেছিল।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু রোমানদের বিরুদ্ধে একদল মুজাহিদ পাঠান, যার মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ছিলেন। রোমানরা মুসলিমদের এই দলটিকে বন্দি করে তাদের তৎকালীন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে সম্রাট হেরাক্লিয়াস (রোম সম্রাট)-এর দরবারে নিয়ে যায়।

রোম সম্রাট আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীদের ঈমান ও বীরত্বের কথা জানতেন। তিনি আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে পরীক্ষা করার জন্য এবং খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য বললেন, তুমি যদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাকে মুক্তি দেব এবং আমার রাজত্বের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেব। আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু গর্জে উঠে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যদি তোমার

www.al-itisam.com

পুরো রাজত্ব এবং সমগ্র আরবের রাজত্বও আমাকে দিয়ে দাও যেন আমি চোখের পলকের জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর দ্বীন থেকে ফিরে যাই, তবুও আমি তা করব না।

লোভে কাজ না হওয়ায় সম্রাট এবার নিষ্ঠুরতার পথ ধরলেন। দরবারে বিশাল এক তামার কড়াই এনে তাতে তেল ঢেলে ফুটানো হলো। এরপর একজন মুসলিম বন্দিকে নিয়ে এসে সেই ফুটন্ত তেলের কড়াইতে ফেলে দেওয়া হলো। মুহূর্তের মধ্যে তার মাংস গলে হাড় ভেসে উঠল। এই দৃশ্য দেখে আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। জল্লাদরা বাদশাহকে বলল, সে কাঁদছে। বাদশাহ ভাবলেন, আব্দুল্লাহ এবার ভয় পেয়েছেন। তাই তাকে ডেকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি, কারণ আমার মনে হলো আমার তো প্রাণ মাত্র একটি, যা এখন এই কড়াইতে ঢেলে দেওয়া হবে। আমার আফসোস! আমার যদি এমন শত প্রাণ থাকত এবং আল্লাহর রাস্তায় প্রতিটি প্রাণ এভাবে কুরবান হতো, তবে কতই না উত্তম হতো!

ছাহাবীর এই অতিপ্রাকৃতিক ঈমান দেখে রোম সম্রাট স্তব্ধ ও বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এই মানুষকে হত্যা করে হারানো যাবে না। তখন সম্রাট নিজের সম্মান বাঁচাতে একটি আপসের প্রস্তাব দিয়ে বললেন, তুমি কি আমার মাথায় একটি চুমু দেবে? তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দেব। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য একজন কাফের সম্রাটের মাথায় চুমু দেওয়াকে আত্মমর্যাদার পরিপন্থি মনে করলেন। তিনি পাল্টা শর্ত দিয়ে বললেন, তুমি যদি আমার সাথে থাকা সমস্ত মুসলিম বন্দিকে মুক্তি দাও, তবেই কেবল আমি তোমার মাথায় চুমু দিতে পারি; অন্যথা নয়।

বাদশাহ বললেন, ঠিক আছে, আমি সবাইকে মুক্তি দেব। তখন আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সকল মুসলিম বন্দির প্রাণের খাতিরে সম্রাটের কপালে বা মাথায় চুমু দিলেন এবং সম্রাট তার ওয়াদা অনুযায়ী সমস্ত মুসলিম বন্দিকে সসম্মানে মুক্তি দিল।

বন্দিদের নিয়ে যখন আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় ফিরে এলেন, তখন আমীরুল মুমিনীন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এই ঘটনা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি মদীনার সকল মুসলিমদের ডেকে বললেন, حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُقَبِّلَ رَأْسَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ، وَأَنَا أَبْدَأُ ‘প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হলো আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহর মাথায় চুমু দেওয়া, আর এ কাজ আমি নিজেই প্রথম শুরু করছি। অতঃপর উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে গিয়ে সবার সামনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কপালে চুমু খেলেন’।[১১]

বাহরাইনের শাসক কে ছিলেন?

হাদীছে এসেছে, عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ ‘বাহরাইনের প্রধান ব্যক্তি/শাসক’। তিনি ছিলেন, আল-মুনযির ইবনু সাওয়া। তিনি বাহরাইনের শাসক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে আলা ইবনুল হাযরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর দাওয়াত পেয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে ইসলাম কবুল করেন। তার ইসলাম গ্রহণের কারণে রাসূল ﷺ তাকেই বাহরাইনের আমীর হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর কিছুদিন পরে আল-মুনযিরও মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল ছিলেন। তার মৃত্যুর পর বাহরাইন অঞ্চলে মুরতাদ ও মিথ্যা নবীর ফিতনা দেখা দেয়, যা আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু কঠোর হস্তে দমন করেন।

কিসরার সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা এবং রাসূল ﷺ-এর মু‘জিযা:

কিসরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের খবর পেল, তখন সে শুধু চিঠি ছিঁড়ে ফেলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং ইয়ামানে তার প্রতিনিধি বাযান-এর কাছে পাল্টা লিখে পাঠায় এভাবে—‘আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, কুরাইশের এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করছে। তুমি তার কাছে যাও এবং তাকে তওবা করতে বলো। যদি সে তওবা করে, তাহলে ভালো আর যদি না করে, তাহলে তার মাথা কেটে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও’।

বাযান এই বার্তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জবাবে লিখলেন, إِنَّ اللهَ وَعَدَنِي بِقَتْلِ كِسْرَى فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ‘আল্লাহ আমাকে ওয়াদা

১১. হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তামঈযিছ ছাহাবাহ, ৪/৫৮-৫৯ (আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনী); ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/১৪-১৫; ইমাম ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৭/১১১-১১২ (হিজরী ১৯ সনের ঘটনাবলি); আবূ নুয়াইম আল-আসফাহানী, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১৩৫; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক, ২৭/৩৪৭-৩৪৯।

www.al-itisam.com

করেছেন যে, অমুক মাসের অমুক দিনে কিসরাকে হত্যা করা হবে। তথা কিসরা নিহত হবে’।

বাযান চিঠি পেয়ে বললেন, إِنْ كَانَ نَبِيًّا سَيَكُوْنُ مَا قَالَ অর্থাৎ তিনি যদি সত্যিই নবী হন, তাহলে তিনি যা বলেছেন তা অবশ্যই ঘটবে।

ইতিহাসের বর্ণনায় এসেছে, কিসরা নিজের ছেলে শেরওয়েহ-এর হাতে নিহত হয়। ইবনু কাছীর উল্লেখ করেন, ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী কিসরা তার ছেলে শিরোয়াহ-এর হাতে ৭ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসের ১০ তারিখ মোতাবেক মঙ্গলবার রাতে নিহত হয়।

ইতিহাসে আরও বর্ণিত হয়েছে, কিসরা পারভেজ আগে থেকেই বুঝেছিল যে, তার ছেলে তাকে হত্যা করতে পারে। তাই সে একটি শিশিতে বিষ রেখে তার উপর লিখে রাখে, الدواء النافع للجماع অর্থাৎ ‘সহবাসের জন্য উপকারী ঔষধ’।

পরে শিরোয়াহ তার পিতা পারভেজকে হত্যা করে রাজকোষে প্রবেশ করে। রাজকোষের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহশালায় সে এই শিশিটি পায়। সে সেটিকে যৌন শক্তিবর্ধক ঔষধ ভেবে সেবন করে এবং কিছুদিনের মধ্যে সে নিজেও মারা যায়। এভাবেই পারস্য সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

যাহোক, যখন রাসূল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কিসরা সেই দিনেই নিহত হলো, যেদিনের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছিলেন। তখন এ সংবাদ বাযানের কাছে পৌঁছল এবং সে নিজে ইসলাম গ্রহণ করল। তার সঙ্গে থাকা পারসিকরাও ইসলাম গ্রহণ করল।

এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুঅতের একটি স্পষ্ট নিদর্শন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে গায়েবের খবর দেননি; বরং আল্লাহ তাঁকে যা জানিয়েছিলেন, তিনি তা-ই বলেছেন।[১২]

এই হাদীছের শিক্ষা বা সারমর্ম:

১. রাসূল ﷺ চেইন অফ কমান্ড বা নেতৃত্বের শৃঙ্খল অনুসরণ করতেন। কিসরার কাছে চিঠি পাঠাতে কার মাধ্যমে পাঠাতে হবে, তা তিনি জানতেন।

২. দাওয়াতকে যত মাধ্যমে সম্ভব ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। রাসূল ﷺ লেখাপড়া না জানার পরও তাঁর চিন্তাশক্তি এত স্মার্ট ছিল যে, তিনি শুধু মক্কা বা মদীনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং চিঠির মাধ্যমে তৎকালীন বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন।

৩. অহংকার করা ভালো নয়। অহংকারে অনেক সময় পতন হয়।

৪. সত্য গ্রহণের মানসিকতা সবসময় থাকা উচিত।

৫. নবীদের বদদু‘আ ও অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা নবীদের দু‘আ মহান আল্লাহ কবুল করে থাকেন।

৬. একটি ছোট্ট চিঠি থেকেও একটি সাম্রাজ্যের পতন হয়ে যেতে পারে। তাই কোনো জিনিসকে ক্ষুদ্র হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)



১২. ইমাম ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ‘নবুঅতের প্রমাণাদি’ অধ্যায়; ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী, তারীখুত তাবারী, ২/৬৫৪-৬৫৭ (হিজরী ৮ম সনের ঘটনাবলি)।

www.al-itisam.com

অন্ধ অনুসরণের বেড়াজালে ইসলাম

-আব্দুল গাফফার মাদানী*

প্রশংসা মাত্রই মহান রবের, যিনি আমাদেরকে অতি উত্তমরূপে মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করে এই ধরণিতে পাঠিয়েছেন তাঁর দাসত্বের জন্য। দাসত্বের প্রতিদানস্বরূপ ঘোষণা দিয়েছেন, ‘যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়াত আসবে; তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না’ *(আল-বাকারা, ২/৩৮)*। ওইদিকে শয়তান আল্লাহর সামনে শপথ করে বলেছিল, ‘আপনার ইযযতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব’ *(ছোয়াদ, ৩৮/৮২)*।

কিন্তু শয়তান মানুষকে কীভাবে বিপথগামী করে তার অনুসারী বানাবে আর মানুষই-বা কীভাবে তার প্ররোচনায় জাহান্নামের অভিমুখী হবে? মূলত শয়তান ধর্মীয় মোড়কে ধার্মিকদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দল, নেতা ও দুনিয়ার চাকচিক্যের আকার ধারণ করে মানবজাতির সামনে উপস্থিত হয়, তাদের অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণে প্রলুব্ধ করে এবং পরোক্ষভাবে তাদেরকেই আল্লাহর আসনে বসিয়ে শয়তানের দাসে পরিণত করে। আর মুসলিম জাতি সেই ধর্মীয় মোড়কে শয়তানী ধোঁকাকে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং বিভিন্ন দল, ভ্রান্ত আক্বীদা বা বিশ্বাস ও মানহাজে বিভক্ত হচ্ছে। প্রত্যেক দলের অনুসারীরা সেই দলের দলীয় সংবিধান আর দলীয় নেতাকে প্রশ্নাতীতভাবে অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ করাকেই দ্বীন মনে করছে আর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে প্রত্যেকেই বলছে, আমাদের কাছে যা আছে, আমরা তা নিয়েই আনন্দিত। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে, তা নিয়ে আনন্দিত’ *(আর-রূম, ৩০/৩২)*।

মূলত ইসলামে অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ ও বিভক্তির কোনো সুযোগ নেই। সেটা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, আকাবির, পীর, অলী-আউলিয়া, দল, নেতা, দেশ বা দুনিয়ার চাকচিক্য যে নামেই বা দোহাই দিয়ে হোক-না কেন! আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন, ‘আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ করো, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন; তখন তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃপুরুষদের যার উপর পেয়েছি’ *(আল-বাকারা, ২/১৭০)*।

ইসলামে অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণ ও বিভক্তি নিষিদ্ধ হলেও এটি প্রতিটি মুসলিম দেশ ও জাতিকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং উম্মাহকে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এর কারণ এবং এ থেকে উত্তরণের উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা-আল্লাহ!

১. ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ:

আমাদের মাঝে অধিকাংশ মানুষকেই দেখা যায় যে, শুধু একজন আলেম, শিক্ষক, পীর বা নেতার অন্ধ অনুসরণ করে চলেছেন। তিনি যা বলেন, তার নিকট সবই সঠিক বলে বিশ্বাস করেন এবং অন্য কারও কথা শুনেন না বা মানেন না। একটু ভেবে দেখুন তো! সত্য ও সঠিক একজনের মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ? আমরা যদি ছাহাবীদের দিকে নযর দেই, তাহলেই সবকিছু দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে। এ বিষয়ে রফউল মালাম আন আয়িম্মাতিল আ‘লাম (رفع الملام عن أئمة الأعلام) বইটি পড়লে কিছুটা হলেও ভুল ধারণার নিরসন হবে। যদি বিষয়টি এমনই হতো যে, একজনের নিকট সব ইলম বা সত্য রয়েছে, তাহলে যেকোনো একজন ছাহাবীর কথা মেনে চলাই যথেষ্ট হতো। আর যদি মনে করি যে, বড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তাহলে বড় ছাহাবীরা অধঃস্তন ছাহাবীদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না। অথচ একাধিক মাসআলা ও ফতওয়ার ক্ষেত্রে আশারায়ে মুবাশশারা-সহ বড় বড় ছাহাবীগণ তাদের চেয়ে অধঃস্তন ছাহাবীদের থেকে অনেক বিষয়ে ইলম আহরণ করেছেন।

২. নেতার অন্ধ অনুসরণ:

পার্থিব জীবনের স্বার্থে আমরা পরকাল বিক্রি করে ফেলি এবং নেতা যা বলেন, তাই অনুসরণ করি। এটা আমরা করি সামান্য কিছু পাওয়ার আশায় অথবা তার নিকট ভালো ও প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভের আশায়। মূলত পরকাল সম্পর্কে আমাদের সঠিক ও স্বচ্ছ কোনো ধারণা নেই অথবা দৃঢ় বিশ্বাস নেই, তাছাড়া কেন আমি আমরা স্রষ্টার সেই অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মোহে পড়ে শরীআত বিরোধী কাজে জড়িয়ে যাচ্ছি? যারা আল্লাহকে

১৩* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

www.al-itisam.com

বাদ দিয়ে নেতার অন্ধ অনুসরণ করবে, তাদের পরিণতির বর্ণনা কুরআনে এভাবে এসেছে,﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ 'তারা আরও বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় বড় লোকের (বুযুর্গদের) আনুগত্য করেছিলাম, ফলে তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে' *(আল-আহযাব, ৩৩/৬৭)*। অর্থাৎ আমরা তোমার পয়গম্বর ও দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারীদেরকে বর্জন করে নিজেদের নেতা, বুযুর্গ ও বড়দের কথামতো চলেছিলাম; কিন্তু আজ আমরা বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাদেরকে তোমার পয়গম্বর থেকে দূরে রেখে পথভ্রষ্ট করেছিল। বাপ-দাদাদের প্রথার অনুসরণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ আজও বহু মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ।

হায়! মুসলিমরা যদি মানুষের তৈরিকৃত পথ বর্জন করে আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করত এবং কুরআন ও হাদীছের সরল পথ অবলম্বন করত, তাহলে তাদের কতই না মঙ্গল হতো! কারণ পরিত্রাণ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণেই নিহিত আছে; বুযুর্গ ও বড়দের অন্ধ অনুকরণে অথবা বাপ-দাদার প্রাচীন পথ অবলম্বনে নয়।

৩. দলের অন্ধ অনুসরণ:

বর্তমানে অন্ধ অনুসরণ-অনুকরণের বড় একটি প্ল্যাটফর্ম হলো দল বা সংগঠন, হোক সেটা ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক। নিজ দল-সংগঠন ব্যতীত অন্য কোনো দল-সংগঠন এখানে মূল্যহীন। যদিও ভিন্ন কোনো দল অথবা তাদের কোনো কথা-কাজ হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক-না কেন! যদিও উম্মাহ, দেশ এবং জাতির খেদমতে তাদের বৃহৎ বৃহৎ অবদান থাকুক-না কেন! ভিন্ন দলের ছিদ্রান্বেষণ, গীবত চর্চা, পরনিন্দা ও ক্ষতিসাধনের অসুস্থ চিন্তায় আমরা ভয়ানকভাবে আক্রান্ত। চুন থেকে পান খসতেই ভিন্ন দল বা দলীয় নেতাদের নীতিকথা শোনানো এবং সংশোধনির নামে সম্মানহানির মহোৎসবে আমরা মেতে উঠি, সেই সাথে ফেসবুকসহ যাবতীয় সোশ্যাল মিডিয়াকে সরগরম করে ফেলি আর তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। কিন্তু ঠিক একই ধরনের বা তার চেয়ে বড় অপরাধ কিংবা ভুল নিজ দল কিংবা সংগঠনের কেউ করলে মুমিনের দোষ ঢেকে রাখার ফযীলত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলো কিতাবের পাতায় পাতায় তন্নতন্ন করে চষে বেড়াই অথবা সেগুলোর শারঈ ভিত্তি সাব্যস্ত করতে বিভিন্ন গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করি।

৪. পরিবারের অনুসরণ:

সাধারণত একটি পরিবারের সন্তানেরা বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানির অনুসরণ করে চলে। সে মনে করে যে, তার পরিবারের লোকেরা যা করেন, সবই সঠিক অথবা ভালো বলেই তো তারা করেন, তাহলে আমার করতে বাধা কোথায়? কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো- আমরা যারা পরিবারের অভিভাবক রয়েছি, তারা সেই সন্তানদের সামনে কোনো কাজ করার সময় চিন্তা করি না। ভালোমন্দ যেকোনো কাজ বা কথা হুটহাট করে ফেলি। কিন্তু কোনো কাজ করা ও কোনো কথা বলার পূর্বে আমার একটু ভাবার প্রয়োজন ছিল যে, আমি যা করব অথবা বলব, আমার সন্তানেরাও সেটার অনুসরণ করে বসবে।

যদি কোনো পিতা টাখনুর নিচে কাপড় পরে; মদ, জুয়া, গাঁজা, ফেন্সিডিল, ইয়াবা, পান, বিড়ি, সিগারেট, জর্দা ইত্যাদি খাওয়াতে অভ্যস্ত হয়; অপর নারীর সাথে অবাধে কথাবার্তায় (পরকীয়ায়) লিপ্ত হয় এবং অশ্লীল ভাষী হয়, তাহলে তার সন্তান তার মতো হওয়া কি অসম্ভব? কোনো মা যদি বেপর্দা, বেহায়া, অহংকারী, স্বামীর অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য, গীবতকারী ও কর্কশভাষী হয়; তাহলে সে মায়ের আচার-আচরণের প্রভাব কি তার সন্তানদের প্রতি পড়বে না? অবশ্যই পড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্যই তো সাড়ে ১৪০০ বছর আগে রাসূল ﷺ সেই বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন।

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক নবজাতকই ফিত্বরাতের উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী, নাছারা বা মাজূসী (অগ্নিপূজারি) হিসেবে গড়ে তোলে। যেমন- চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোনো (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু (কুরআনের একটি আয়াত) বললেন, 'আল্লাহর দেওয়া ফিত্বরাতের অনুসরণ করো, যে ফিত্বরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন' *(আর-রূম, ৩০/৩০)*।[১৪]

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/ ১৩৫৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৮।

www.al-itisam.com

যদিও আমরা আমাদের সন্তানদের আদর্শবান সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু এগুলোই তাদের আদর্শবান হিসেবে গড়ে ওঠার প্রতিবন্ধক। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতামণ্ডলী, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তাঁর অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে, যা তাদেরকে আদেশ করা হয়’ *(আত-তাহরীম, ৬৬/৬)*।

এতে মুমিনদের পালনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তা হলো নিজেদেরকে সংস্কার ও সংশোধন করার সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকেও সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও তারবিয়াত দেওয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। যাতে তারা জাহান্নামের জ্বালানি হওয়া থেকে বেঁচে যায়। আর এই কারণেই রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘শিশুরা যখন সাত বছর বয়সে পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে ছালাত আদায়ের আদেশ দাও। আর দশ বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পর (তারা ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন হলে) তাদেরকে (শিক্ষামূলক) প্রহার করো’।[১৫]

ফক্বীহগণ বলেন, এভাবে তাদেরকে ছিয়াম রাখারও আদেশ দিতে হবে এবং অন্যান্য শরীআতের বিধিবিধান অনুসরণ করার শিক্ষা দিতে হবে। যাতে সাবালক হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সত্য দ্বীন মানার অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়।

৫. সমাজের অনুসরণ:

মানুষ হিসেবে অবশ্যই কোনো না কোনো সমাজে বসবাস করতে হয়। আর একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের পরিবারের লোকজনের সাথে চলাফেরা করতে হয়। এই সুবাদে আমাদের সন্তানেরা সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন ধরনের ছেলেমেয়েদের অনুসরণ করে। সন্তানেরা মনে করে, তারা তো আমাদের প্রতিবেশী এবং এক সমাজে একই সাথে চলাফেরা করি, উঠাবসা করি, তারা তো আলাদা কোনো জাতি না; তাহলে তাদের মতো চলাফেরা করাতে সমস্যা কোথায়? এজন্য নিজ পরিবার ভালো হলেও সমাজের কারণে সন্তানেরা নষ্ট হয়ে যায়। আর একটি সমাজ ও পরিবারকে নষ্ট করার জন্য একটি নষ্ট ছেলেই যথেষ্ট, ১০/২০ জনের প্রয়োজন নেই। সে নষ্ট সন্তানটি হতে পারে আমার বা আপনারই ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগ্নে-ভাগ্নি বা নাতি-পুতি। এজন্যই তো আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ‘আর জেনে রেখো! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক পরীক্ষা। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার’ *(আল-আনফাল, ৮/২৮)*।

সাধারণত সন্তান ও সম্পদ মানুষকে খেয়ানত করতে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করে। সেজন্য সে দুটিকে ফেতনা (পরীক্ষা) বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা মানুষের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, তাদের ভালোবাসায় আমানত ও আনুগত্যের হক্ব পূর্ণরূপে তারা আদায় করে কি-না? যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে, তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়; অন্যথা সে অনুত্তীর্ণ ও অসফল বলে গণ্য হয়। এই অবস্থায় এই সম্পদ ও সন্তান তার জন্য আল্লাহর শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যারা তোমাদেরকে হারাম উপার্জন করতে প্ররোচিত করে এবং আল্লাহর অধিকার আদায় করতে বাধা দেয়। আর এই পরীক্ষায় তোমরা তখনই সফল হতে পারবে, যখন আল্লাহর সাথে অবাধ্য আচরণে তাদের আনুগত্য করবে না। অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর নেয়ামতও বটে এবং তা মানুষের পরীক্ষার মাধ্যমও বটে। আল্লাহ দেখতে চান যে, তাঁর অনুগত ও অবাধ্য কে?

৬. বাপ-দাদা, বুযুর্গ ও বড়দের অন্ধ অনুকরণ:

প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি প্রজন্মে শিরক-বিদআত ও গোমরাহিতে নিমজ্জিত হওয়ার সব থেকে বড় উপকরণের একটি হলো বাপ-দাদা, বুযুর্গ ও বড়দের অন্ধ অনুকরণ। নবী-রাসূল ও সৎ মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করে শিরক করার পাশাপাশি মানুষের শিরকে নিমজ্জিত হওয়ার অপর কারণ মূলত এটিই। এর ফলে তারা পূর্বপুরুষদেরকে যে সকল কর্মকাণ্ড করতে দেখেছে, সেটাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরেছে। পূর্বপুরুষদের কাজগুলো সুস্থ বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য কি-না, মুহূর্তের জন্যও তারা তা ভেবে দেখার অবকাশ পায়নি। উদাহরণস্বরূপ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর জাতির কথাই বলা যাক, তিনি যখন তার জাতিকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে একটু ভাবতে বললেন এবং বললেন, তোমরা যে সকল মূর্তির পার্শ্বে অবস্থান করছ এবং প্রয়োজনের সময় আহ্বান করে উপাসনা করছ, তারা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায় অথবা তারা কি তোমাদের কোনো কল্যাণ বা ক্ষতি করতে পারে? তখন তারা এ

১৫. আবূ দাঊদ, হা/৪৯৫।

www.al-itisam.com

বিষয়ে কোনো চিন্তাভাবনা ছাড়াই এক বাক্যে বলেছিল, ﴿قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ ‘আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এমনটি করতে দেখেছি’ *(আশ-শুআরা, ২৬/৭৪)*।

তাদের এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে- তারা যা করছে তা সঠিক কি-না, এ নিয়ে তাদের ভাবার কোনো অবকাশ নেই। তাদের দেব-দেবীগুলো তাদের ডাক শ্রবণ করে কি-না বা এরা বাস্তবে তাদের কোনো লাভ বা ক্ষতি করতে পারে কি-না, তাও খতিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা বংশ পরম্পরায় এসব মূর্তির উপাসনার বিষয়টি পেয়ে এসেছে। আর এ পাওয়াটুকুই তাদের নিকট এদের উপাসনা করা সঠিক বলে প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই তাদের অনুসরণ করা থেকে তারা বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হতে প্রস্তুত নয়।

একইভাবে আমরা যখন মক্কার মুশরিকদের দিকে লক্ষ করি, তখনও দেখতে পাই যে তারাও কা‘বা ও অন্যান্য স্থানে রাখা মূর্তিসমূহের উপাসনা করার ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করেছে। তারাও অতীত জাতির ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল, ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ ‘আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো, তখন তারা বলে, বরং আমরা সেটাই অনুসরণ করব, যা আমাদের পিতৃপুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পূর্বপুরুষদের কোনোই জ্ঞান ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না’ *(আল-বাকারা, ২/১৭০)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা পূর্বপুরুষের তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে।

মূলত কুরআন কারীম বিভিন্নভাবে বাপ-দাদা, বুযুর্গ ও বড়দের অন্ধ অনুকরণকে নিন্দা জানিয়েছে। যেমন কুরআনে এসেছে, ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ ‘যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা তা অনুসরণ করো, জবাবে তারা বলে, আমরা বরং তারই অনুসরণ করব, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি’ *(লুকমান, ৩১/২১)*।

আজও যদি বিদআতীদেরকে বুঝানো হয় যে, দ্বীন ইসলামে এই বিদআতগুলোর কোনো ভিত্তি নেই; তবে তারা এই উত্তরই দেয় যে, এগুলো তো আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট থেকেই চলে আসছে। অথচ হতে পারে যে, পূর্বপুরুষরাও দ্বীনী ব্যাপারে অজ্ঞ এবং হেদায়াত থেকে বঞ্চিত ছিল। কাজেই শরীআতের দলীলের মোকাবেলায় বাপ-দাদার বা ইমাম ও আলেমদের (অন্ধ) অনুসরণ করা ভুল। মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে (ভ্রষ্টতার) এই কর্দম থেকে বের করুন- আমীন!

৭. খেলা এবং খেলোয়াড়দের ভক্তিতে মাত্রাতিরিক্ত সীমালঙ্ঘন:

আজ আমাদের সন্তানেরা খেলোয়াড়দের ভক্তিতে সীমালঙ্ঘনের মাত্রা এতটাই ছাড়িয়েছে যে, তারা শুধু পরকালই নয়; বরং ইহকালকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়ে এক ভয়ানক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। পৃথিবীর একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ মাঠে-ময়দানে ও খেলাধুলার আনন্দমেলায় নিজেদের অবসর-বিনোদন ছাড়াও তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে চিত্তবিনোদন করছে।

অবশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছু খেলাধুলা আছে, যাতে সত্যিই মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে। সুস্থ শরীর গঠনে ও মানসিকভাবে মনে ফুর্তি আনতে অথবা পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়াতে খেলাধুলার একটা বড় ভূমিকা আছে। কিন্তু মুসলিম যুবসমাজের জন্য তা নিয়ম-ছাড়া, বাঁধন-হারা ও সীমাহীন নয়। জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য ঠিক রেখে (বৈধ) উপলক্ষ্যে যদি যথানিয়মে ব্যবহার করা হয়, তবেই আমাদের মঙ্গল; নচেৎ উপলক্ষ্য যদি লক্ষ্যে পরিণত হয়, তাহলেই আমাদের সর্বনাশ। নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিছু খেলার মধ্যে উপকার থাকলেও তার অপকারিতার দিকটা ভুলে গেলে চলে না। ভুললে হয়তো এমনও হতে পারে যে, জীবনের জমা-খরচের হিসাবে কেবল ‘নাকের বদলে নরুন’ পেয়ে সন্তুষ্ট থেকে যাব। সাধারণত প্রায় সকল খেলাতে যেমন খেলোয়াড় ও তাদের দর্শক-সমর্থকদের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়, তেমনি সৃষ্টি হয় বিদ্বেষ ও শত্রুতা এবং কখনো কখনো তা হিংসা থেকে শুরু করে মারামারি ও দাঙ্গাতে গিয়ে পৌঁছে। এই খেলার টানে মুসলিম যুবকের কত ছালাত নষ্ট হয়, ছালাতের জামাআত ছুটে যায় তার ইয়ত্তা নেই। এমনকি যারা নিয়মিত ছালাত আদায় করে, তাদেরও অনেকে খেলার কারণে সময় পার করে ক্বাযা পড়ে নেয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ‘দুর্ভোগ (ওয়ায়েল নামক জাহান্নাম) সেই মুছল্লীদের জন্য, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে উদাসীন’ *(আল-মাঊন, ১০৭/৫-৬)*। তিনি আরও বলেন, ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ ‘অতঃপর তাদের পর এলো অপদার্থ পরবর্তীরা, যারা ছালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। যার ফলে তারা অচিরেই গায় (জাহান্নামের এক উপত্যকা) প্রত্যক্ষ করবে’ *(মারইয়াম, ১৯/৫৯)*।

এই খেলাধুলা ও বিভিন্ন শরীর-চর্চায় অনেক মুসলিম যেভাবে তাদের লজ্জাস্থানকে উন্মুক্ত করে তা যেন মহানবী ﷺ-এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার শামিল। একজন নারীর পুরো শরীর হলো লজ্জাস্থান, কেবল গুপ্তাঙ্গ ও বক্ষযুগলই নয়; বরং তার দেহের অন্যান্য অঙ্গও লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত, যা স্বামী ছাড়া অন্যের সামনে প্রকাশ করতে লজ্জা হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে পুরুষের কেবল প্রস্রাব ও পায়খানার দ্বারই লজ্জাস্থান নয়; বরং তার পার্শ্ববর্তী উপর দিকে নাভি পর্যন্ত এবং নিচের দিকে হাঁটু পর্যন্ত লজ্জাস্থান, যা উন্মুক্ত করতে একজন পুরুষকে লজ্জা করা উচিত। কিন্তু খেলোয়াড় যুবক-যুবতিরা লজ্জার মাথা খেয়ে কেবল নাম কেনার উদ্দেশ্যে নিজেদের লজ্জাস্থান খুলে দেখাতে এতটুকুও সংকোচ করে না। কারণ তাদের গোড়ার শিক্ষাই হলো 'সংকোচের বিহ্বলতায় নিজেরে করো না ম্রিয়মাণ'। অথচ রাসূল ﷺ বলেন, 'লজ্জা হলো ঈমানের অন্যতম শাখা'।[১৬] মহানবী ﷺ আরও বলেন, 'নারী হলো পুরোটাই লজ্জার জিনিস'।[১৭] তিনি ﷺ আরও বলেন, 'পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত লজ্জাস্থান'।[১৮] তিনি ﷺ আরও বলেন, 'তুমি তোমার উরু খুলে রেখো না এবং কোনো জীবিত অথবা মৃতের উরুর দিকে তাকিয়ে দেখো না'।[১৯] অন্যত্র তিনি ﷺ বলেন, 'তুমি তোমার উরু ঢেকে নাও। কারণ উরু হলো লজ্জাস্থান'।[২০]

এমনও কিছু খেলার উদ্ভব হয়েছে যেখানে যৌনচারিতা, চোখ ও হাতের ব্যভিচার দৃশ্যমান। যে খেলায় সুপ্ত যৌন অনুভূতিকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগ্রত করা হয়। আর এটা তখন হয়, যখন প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কোনো কিশোরী বা যুবতি দল! যখন শুধু নাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে নারী প্রগতিবাদের দোহাই দিয়ে নারীবাদী স্বার্থপর পুরুষ উদ্যোক্তা ও দর্শকদের সামনে কতক যুবককে উষ্ণ ছোঁয়া দিয়ে থাকে এবং গরম পরশ খেয়ে থাকে।

অনেক খেলায় অর্থের অপচয় হয়। জুয়া ও জুয়া-জাতীয় এসব খেলায় কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ হয়। একটি টুর্নামেন্ট চালাতে, বাইরের টিম আনতে, খেলার বিভিন্ন সাজসরঞ্জাম, পুরস্কারসহ আরও অন্যান্য খাতে অপব্যয় হয় লক্ষ লক্ষ ডলার। একদিকে দেশের এক শ্রেণির মানুষ দারিদ্র্যের কারণে না খেয়ে মরে, আর অন্য দিকে আরেক শ্রেণির বিলাসী মানুষ ৫ টাকার টিকিট ৫০০ টাকায় কিনে খেলা দেখতে দূরদূরান্তে সফর করে। একদিকে সরকারের বিশেষ খাতে ঘাটতি পূরণের জন্য দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ানোর পাশাপাশি জনগণের উপর বিভিন্নভাবে ট্যাক্স বসানো হয়, অপরদিকে খেলার পেছনে ব্যয় করা হয় তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি টাকা।

ভাবতে আরো অবাক লাগে যে, একটা কাঠের ব্যাট বিক্রয় কয়েক লক্ষ টাকায়। আর তা এ জন্য যে, ঐ ব্যাট বিশ্বকাপ জিতে জাতির মান রক্ষা করেছে এবং এই ক্রয়ের ফলে ক্রেতার নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে। খেলার পাগল বন্ধু আমার! মহান প্রতিপালক আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(আল-ইসরা,* ১৭/২৬-২৭)। মহানবী ﷺ বলেন, 'পাঁচটি বিষয়ে কৈফিয়ত না দেওয়ার পূর্বে ক্বিয়ামতের দিন কোনো মানুষের পা সরবে না। (তন্মধ্যে একটি বিষয় হলো এই যে) সে তার ধনসম্পদ কোন উপায়ে অর্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে?'[২১]

খেলা তার খেলোয়াড় ও দর্শকদের মানসিক বিকারগ্রস্ত করে ছাড়ে। খেলার নেশা খেলাপ্রেমীদের হার-জিতের সময় এক প্রকার মাতাল করে তোলে। জেতার খবর শোনামাত্র কেউ কেউ খুশিতে কেঁদে ফেলে! বিজয়-উল্লাসে যুবক-যুবতির দল কাপ মাথায় নিয়ে নাচতে শুরু করে।

পক্ষান্তরে হারার খবর শোনামাত্র কেউ কেউ মূর্ছা যায়, কেউ ক্ষোভ ও দুঃখে ফেটে পড়ে নিজের রেডিও-টিভি ভেঙে ফেলে, কেউ কেউ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। মনের বিষণ্নতায় অনেকের ঘুম আসে না কয়েক রাত! কেউ আত্মহত্যা করে খেলার মস্তান বা খেলার শহীদ হয়ে খেলাধুলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নযির সৃষ্টি করে! আর এভাবে খেলা যেন আমাদের জীবনের একটি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে পড়েছে, যার দরুণ তার উন্নতি-অবনতিও আমাদের জীবনে বিরাট আন্দোলন ও পরিবর্তনের তুফান ডেকে আনে।

এতএব, আসুন! গোঁড়ামি, অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ পরিহার করে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে নিরপেক্ষভাবে নিজের জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সচেতনতা বৃদ্ধি করি। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

১৬. ছহীহ বুখারী, হা/৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৫।
১৭. তিরমিযী, ছহীহুল জামে', হা/৬৬৯০।
১৮. ছহীহুল জামে', হা/৫৫৮৩।
১৯. আবূ দাঊদ, ছহীহুল জামে', হা/৭৪৪০।
২০. আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে', হা/৭৯০৬।
২১. তিরমিযী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১২১।

www.al-itisam.com

আল্লাহ তাআলার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ নছীহত

মূল: হাফেয জালালুদ্দীন কাসেমী*
পরিমার্জিত অনুবাদ: তাওহীদুর রহমান সালাফী**

কুরআনুল কারীম-এ সূরা আল-আনআমের ১৫১, ১৫২ ও ১৫৩ পরপর এ তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের জন্য ১০টি আদেশ তুলে ধরেছেন। ১৫১ নম্বর আয়াতে পাঁচটি বিষয় রয়েছে, ১৫২ নম্বর আয়াতে চারটি বিষয় রয়েছে এবং ১৫৩ নম্বর আয়াতে একটি বিষয় রয়েছে। আয়াত তিনটিতে ১০টি বিষয়কে খুব সংক্ষেপে হলেও এমন পরিপূর্ণ অর্থবোধক ও সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেন সমুদ্রকে একটা ছোট্ট পানির পাত্রে বন্দি করে দেওয়া হয়েছে। আয়াতগুলোতে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ নছীহতগুলোকে সামনে রেখে আক্বীদা, জাতি ও সমাজ সংস্কারের কাজ করা যেতে পারে। যদি কোনো সমাজে এই ১০টি বিষয়কে বাস্তবায়ন করা হয়; তাহলে সেই সমাজ আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নতি লাভ করতে থাকবে।

নছীহত করার পদ্ধতি:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

‘বলুন! এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তেলাওয়াত করি যে, তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক্ব দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না, তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারাম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। আর ইয়াতীম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ছাড়া তোমরা তার সম্পত্তির ধারেকাছেও যাবে না এবং পরিমাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে। আমরা কাউকেও তার সাধ্যের চেয়ে বেশি ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না; করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা তাক্বওয়ার অধিকারী হও’ *(আল-আনআম, ৬/১৫১-১৫৩)*।

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ، ﷺ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ.

জাহেলী যুগের লোকেরা কিছু জিনিস খেত এবং ঘৃণাবশত কিছু জিনিস পরিহার করত। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করলেন, তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করলেন এবং তাতে কিছু জিনিস হালাল করলেন আর কিছু জিনিস হারাম করলেন। তিনি যা হালাল করেছেন, তা হালাল এবং যা হারাম করেছেন, তা হারাম আর যেগুলো সম্পর্কে নীরব থেকেছেন, তাতে ছাড় দেওয়া হয়েছে।[২৩]

উপরিউক্ত হাদীছ থেকে জানা যাচ্ছে, হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।

কারও এ অধিকার নেই যে, তারা কোনো হালাল বস্তুকে তাঁর অনুমতি ছাড়া নিজের উপর হারাম করে নিবে। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম করে বলেছিলেন, আমি মধু খাব না (যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর মন খারাপ না হয় এই ভেবে)। তখন সূরা আত-তাহরীম এর প্রথম আয়াতে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হয়েছে,﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ‘হে

২২* বিশিষ্ট দাঈ, ভারত।
**ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, উত্তরপ্রদেশ, ভারত; শিক্ষক, সরল পথ একাডেমি, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

২৩. আবূ দাঊদ, ‘খাদ্যদ্রব্য’ অধ্যায়, হা/৩৮০০, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

নবী! আল্লাহ আপনার জন্য যা বৈধ করেছেন, আপনি তা হারাম করছেন কেন? আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছেন; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আত-তাহরীম, ৬৬/১)*।

তবে হ্যাঁ, আল্লাহর অনুমতিতে নবী ﷺ-ও কোনো হারাম জিনিসকে হালাল এবং হালাল জিনিসকে হারাম করতে পারেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

'যারা অনুসরণ করে রাসূলের, নিরক্ষর নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। আর তাদেরকে তাদের গুরুভাব ও শৃঙ্খল হতে মুক্ত করেন, যা তাদের উপর ছিল। কাজেই যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাঁর সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৫৭)*। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

'তোমরা লড়াই করো আহলে কিতাবের সেসব লোকের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম মনে করে না আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযিয়া দেয়' *(আত-তাওবা ৯/২৯)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর অনুমতিতে নবী ﷺ-এর এ হালালকে হারাম করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার দুনিয়ার আর কোনো ব্যক্তির নেই। হোক না তিনি ছাহাবী, ওলী অথবা ইমাম।

আল্লাহ তাআলা হারাম করার সাথে সাথে প্রভুত্বের গুণের কথা বলেছেন। যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা যে জিনিসগুলো হালাল করেছেন, তা বান্দাদের জন্য লাভদায়ক এবং যেগুলো হারাম করেছেন, সেগুলো তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কারণ একজন অভিভাবক তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিকর জিনিস ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: শিরক থেকে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ 'তোমরা তাঁর সাথে কোনো শরীক করবে না' *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*।

হারাম জিনিসগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা। উল্লিখিত আয়াতে সবকিছুর আগে এটাকেই বলা হয়েছে। শিরক এত বড় গুনাহ যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন; কিন্তু শিরকের গুনাহ মাফ করবেন না এবং তার উপর জান্নাত হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ 'নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই' *(আল-মায়েদা, ৫/৭২)*।

নবী ﷺ-এর একটি হাদীছে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, يَقُولُ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ عَمِلْتَ قِرَابَ الْأَرْضِ خَطَايَا وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، جَعَلْتُ لَكَ قِرَابَ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً 'মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবীসম গুনাহ করো এবং আমার সাথে অংশীদার স্থাপন না করো; তাহলে আমি তোমাকে পৃথিবীসম ক্ষমা প্রদান করব'।[২৪]

আল্লাহ এখানে শিরকের সমস্ত রূপকে নিষেধ ও হারাম করেছেন, হোক না সেটা অন্য কোনো উপাস্যকে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা অথবা আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর গুণের সাথে গুণান্বিত করে। যেমন ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে ছিফাতে উলূহিয়্যাত তথা ইবাদতের যোগ্য উপাস্য হিসেবে মনে করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ 'তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে, আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ কর? তিনি বলবেন, আপনিই মহিমান্বিত। যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়' *(আল-মায়েদা, ৫/১১৬)*।

একথা মনে রাখা উচিত যে, শিরক করলে অন্তরকে হত্যা করা হয় অর্থাৎ যে অন্তরে তাওহীদ তথা একত্ব নেই, সেই অন্তর মৃতের ন্যায়।

২৪. মুসনাদ আহমাদ, ৫/১৪৭, হা/২১৩১১।

www.al-itisam.com

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার আদেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ‘আর সদাচরণ করবে পিতা-মাতার সাথে’ *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*।

শিরক থেকে নিষেধাজ্ঞার পর মহান আল্লাহ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আর আরবী ভাষায় প্রত্যেক ছোট-বড় অনুগ্রহকে ইহসান বলা হয়। ইহসান তথা সদ্ব্যবহারে মাতার মর্যাদা পিতার থেকে তিন গুণ বেশি।

নবী ﷺ –এর একটি হাদীছে অনুরূপ এসেছে, আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর কাছে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ ‘হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হক্বদার? তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি বললেন, অতঃপর কে? নবী ﷺ বললেন, ‘তোমার মা’। তিনি বললেন, অতঃপর কে? তিনি ﷺ বললেন, ‘তোমার মা’। তিনি বললেন, অতঃপর কে? তিনি বললেন, ‘অতঃপর তোমার পিতা’।[২৪] অন্য একটি হাদীছে নবী ﷺ বলেন, لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ ‘তিন ধরনের ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না— মদ্যপানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং অনুগ্রহ করে খোঁটা প্রদানকারী’।[২৬]

মনে রাখা উচিত যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করাতে বংশীয় সম্পর্কের বিনাশ ঘটে।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: সন্তানদের হত্যা করা হতে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ‘আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিযিক্ব দেই এবং তাদেরকেও’ *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*।

যখন আল্লাহ তাআলা সন্তানসন্ততিকে আদেশ করেছেন যে, তারা যেন নিজের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে তেমনি পিতা-মাতাকেও আদেশ করেছেন তারা যেন নিজ সন্তানসন্ততির উপর অত্যাচার না করে, যেন ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠে ভালোবাসা ও সুসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। শুধু যেন নিজের অধিকারের প্রতি লক্ষ না থাকে, বরং নিজের অপরিহার্য বিষয়গুলোর প্রতিও যেন লক্ষ থাকে।

নবী ﷺ -এর একটি হাদীছে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

আমি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, ‘আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করানো; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’। আমি বললাম, এ তো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, ‘তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে’। আমি আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, ‘তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা’।[২৭]

সন্তানদেরকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করা আল্লাহর উপর ভরসা ও তাঁর উপর নির্ভর না করাই শুধু প্রমাণ করে না; বরং তাকে রিযিক্বদাতা হিসেবে নাকচ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেই যাচ্ছেন, কিন্তু তাদের জন্য রিযিক্বের ব্যবস্থা করেন না –নাঊযুবিল্লাহ-।

বাস্তবতা এটাই যে, মানুষের দৃষ্টি শুধু সেই সব বাহ্যিক কারণ ও কর্মের উপর হয়, যেগুলো সে সময় বিদ্যমান থাকে এবং গুপ্ত কারণসমূহ তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। এই ব্যাপারে বড় বড় অর্থনীতিবিদরাও অধিকাংশ সময় ধোঁকায় পড়ে যায়।

ব্রিটেনের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ‘মালথাস’ উছূলে আবাদী নামক একটি বই লিখে এই মতবাদ পেশ করেছিলেন যে, মানুষের জনসংখ্যা জ্যামিতিক হিসাবে ১-২-৪-৮-১৬ অনুযায়ী বেড়ে চলেছে। যদিও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার যোগানের হিসাব অনুযায়ী ১-২-৩-৪-৫ অনুযায়ী বাড়ছে এবং নিজের মতবাদ অনুযায়ী ব্রিটেনের বর্তমান জনসংখ্যা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার যোগানের হিসাব করে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন যে, যদি জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ব্যবস্থার যোগান এরকম হিসেবেই চলে, তাহলে ব্রিটেন ৫০ বছরের মধ্যে মধ্যে দারিদ্র্যের শিকার হবে এবং তার সমাধানের এই প্রস্তাব রাখেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে আর বিবাহ যথাসম্ভব বিলম্ব করে করতে হবে। কিন্তু মালথাস এর এই দুর্বল মতবাদকে ইতিহাস ভুল প্রমাণ করে ছেড়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে না নিয়ে আসার পরও ব্রিটেনের উন্নতি বেড়েই চলেছে।

২৫. ছহীহ বুখারী, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, হা/৫৯৭১।
২৬. মুসনাদ আহমাদ, ৩/২২৬, হা/১৩৩৮৪, হাসান লি-গয়রিহী।
২৭. ছহীহ বুখারী, ‘তাফসীর’ অধ্যায়, হা/৪৪৭৭।

www.al-itisam.com

বাহ্যিক ফলাফল এটাই দেখা গেল যে, ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়ে গেল, যে কারণটা মালথাসের কাছে অদৃশ্য ছিল। অতএব, পরবর্তী অর্থনীতিবিদরা সেই মতবাদকে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে করত।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: কথাবার্তায় অশ্লীলতা থেকে নিষেধাজ্ঞা

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ ‘আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না, তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে’ *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*।

উল্লিখিত আয়াতে الْفَوَاحِش এর অর্থ হচ্ছে, مَا عَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ অর্থাৎ সেসব কথা ও কাজ যার জঘন্যতা অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে। فَحْشَاء শব্দটি যখন মুনকার তথা খারাপ কাজের বিপরীতে আসে, তখন তার অর্থ হয় শারীরিক আবেগের সীমারেখা পার করে যে কাজ সংঘটিত হয়, তাকে فَحْشَاء বলে।

নবী ﷺ-এর একটি হাদীছে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا ‘সর্বোত্তম চরিত্রবান ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’। (বর্ণনাকারী বলেন) রাসূল ﷺ অশ্লীলভাষীও ছিলেন না এবং অশ্লীলতার ভানও করতেন না’।[২৮]

فاحش بالقول ومتفحش بالفعل অর্থাৎ فاحش (অশ্লীলভাষী) এর সম্পর্ক কথাবার্তার সাথে এবং متفحش (অসদাচরণকারী) এর সম্পর্ক কাজকর্মের সাথে। যে অশ্লীল কথাবার্তা বলবে সে فاحش (অশ্লীলভাষী) এবং যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা খারাপ কাজ করবে সে متفحش (অসদাচরণকারী)।

পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ নছীহত: যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করা নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেন,﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ‘আর তোমরা সেই নফসকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া’ *(আল-আনআম, ৬/১৫১)*।

ইসলামে মানুষের প্রাণের এত মর্যাদা রয়েছে যে, একজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করার সমান।

২৮. তিরমিযী, ‘সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা’ অধ্যায়, হা/১৯৫৭।

কুরআনে إِلَّا بِالْحَقِّ বা (যথার্থ কারণ ছাড়া) এই শব্দ কয়েক জায়গায় এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ‘আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নফসকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না (যেমন- প্রাণের বদলে প্রাণ)’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৬৮)*। অন্য জায়গায় বলেন, ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ‘আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না!’ *(আল-ইসরা, ১৭/৩৩)*।

إِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ যাদেরকে হত্যা করা বৈধ, তারা কয়েক প্রকার রয়েছে— (১) বিবাহিত ব্যভিচারী,[২৯] (২) মুরতাদ,[৩০] (৩) হত্যাকারী *(আল-বাক্বারা, ২/১৭৮)*, (৪) শারঈ খলীফার বায়আত ছাড়িয়ে নিজের হাতে বায়আত করানো ব্যক্তি,[৩১] (৫) বিদ্রোহীদল *(আল-হুজুরাত, ৪৯/৯)*।

নবী ﷺ বলেছেন, لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ‘কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের অংশ আদম আলাইহিস সালাম-এর প্রথম ছেলের (কাবীল) উপর বর্তায়। কারণ সেই সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটায়’।[৩২]

অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের রক্ত প্রবাহিত করা সমস্ত নবীর শরীআতে বড় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষ যেই মাযহাব, ধর্ম ও প্রজন্মের সাথে সম্পর্ক রাখুক না কেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা প্রত্যেক ধর্মের বিধানে বিশেষ করে ইসলামে এটাকে বড় গুনাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, যারা ইসলামবিদ্বেষী তারা স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ইসলামের ওপর অন্যায়ভাবে হত্যা করার অপবাদ লাগায়। যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলবদ্ধভাবে এই অপরাধ করে, তাহলে সে নিজেই তার দায়ভার বহন করবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সে বড় অপরাধী। যেহেতু কাবীল সর্বপ্রথম এই অপরাধ করেছে, সেহেতু এই অপরাধ যেই করবে তার সমান অংশ কাবীলের উপর বর্তাবে। প্রত্যেক সৎকর্ম ও অসৎকর্মের এটাই মূলনীতি।[৩৩]

(ইনশা-আল্লাহ! আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

২৯. মুসনাদ আহমাদ, ৫/১৩২, হা/২১৫২৬।
৩০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৬।
৩১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫২, ১৮৫৩।
৩২. ছহীহ বুখারী, ‘আম্বিয়া কেরাম’ অধ্যায়, হা/৩৩৩৫।
৩৩. মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ রাযী রহিমাহুল্লাহ, শারহে ছহীহ বুখারী।

www.al-itisam.com

ইসলামে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ*

পৃথিবীর বুকে আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের মধ্যে বৃক্ষ অন্যতম। কেননা বৃক্ষ থেকে মানুষ ও প্রাণী খাদ্য হিসেবে ফলমূল লাভ করে। অনুরূপভাবে রৌদ্রের তীব্রতার সময় গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। এমনকি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের মাধ্যমেই মহান প্রতিপালক এ বিশ্বকে সবুজে সুশোভিত করে গড়ে তুলেছেন। পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ ও সতেজ রাখতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। ইসলাম বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় বিশেষভাবে উৎসাহ ও গুরুত্বারোপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে, বৃক্ষ ছাড়া আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ কল্পনাই করা যায় না। পৃথিবীর মূল সম্পদ হলো ভূমি, পানি ও পরিবেশগত বৈচিত্র্য। পৃথিবীর মোট উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় ২৫ শতাংশই বৃক্ষ।

আল্লাহ তাআলা প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের সুস্থ, সুন্দর ও বাসোপযোগী করে অত্যন্ত ভারসাম্যের সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা দেখি, প্রচণ্ড শীতপ্রধান অঞ্চলগুলোতে যেখানে বছরের প্রায় পুরো সময়জুড়ে মাঠ-ঘাট, নদী-নালা সর্বত্র বরফে আচ্ছাদিত থাকে, সেখানেও প্রাকৃতিক উদ্ভিদকুল সবুজের সমারোহে বিকশিত হয়। এমনকি বরফাচ্ছাদিত জলাশয়ের মৎস্যকুলও স্বাভাবিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে স্রষ্টার অপার মহিমার পরিচয় বহন করে।

মানুষ ও প্রাণিকুলের বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তাআলা উদ্ভিদ ও গাছপালা সৃষ্টি করেছেন। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন পানি ও বায়ু। অন্যদিকে পাহাড়-পর্বত প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দিকনির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ‘তিনিই আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। অতঃপর তা (বায়ু) মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তা স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা তা (বৃষ্টি) পৌঁছান, তখন তারা আনন্দিত হয়’ *(আর-রূম, ৩০/৪৮)*। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেছেন, ﴿يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ‘এ পানির সাহায্যে তিনি শস্য উৎপন্ন করেন এবং যায়তূন, খেজুর, আঙুর ও আরও নানাবিধ ফল জন্মান। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে একটি বড় নিদর্শন’ *(আন-নাহল, ১৬/১১)*।

গাছবিহীন পৃথিবী এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করা যায় না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বাণিজ্য—মানুষের যাপিত জীবনের প্রায় সবকিছুই গাছকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গাছ নিধন হলে শুধু একটি বৃক্ষই ধ্বংস হয় না; বরং মানুষসহ সমগ্র প্রাণিকুলের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে। একটি পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ বছরে যে পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে, তা কমপক্ষে ১০ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের বার্ষিক অক্সিজেনের চাহিদা পূরণে সক্ষম।

এ কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। মানবজীবনের উপকরণ হিসেবে সবুজ-শ্যামল গাছপালা ও বিভিন্ন প্রকার ফলদ বৃক্ষের গুরুত্ব প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ‘যে কোনো মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল ফলায় আর তা হতে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায়, তবে তা তার পক্ষ হতে ছাদাক্বা বলে গণ্য হবে’।[৩৫] অন্য হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا ‘যদি ক্বিয়ামত এসে যায় এবং তখন তোমাদের কারো হাতে একটি চারাগাছ থাকে, তবে ক্বিয়ামত হওয়ার আগেই তার পক্ষে সম্ভব হলে যেন চারাটি রোপন করে’।[৩৬]

বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় শুধু পরিবেশই রক্ষা হয় না, বরং এ কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে অনেক ছওয়াবও অর্জন করা যায়। মহান আল্লাহর সৃষ্টি বৃক্ষরাজি যে কত বড় নেয়ামত, কুরআনের একাধিক আয়াত থেকে তার প্রমাণ প্রতীয়মান হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ ‘তারা কি লক্ষ করে না যে, আমি অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি, অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, যা থেকে তাদের গবাদিপশু এবং তারা নিজেরাও আহার গ্রহণ করে?’ *(আস-সাজদাহ, ৪৩/২৭)*।

মরুময় আরবে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন। তথাপি তাঁর বহু বাণী রয়েছে কৃষিকাজের গুরুত্বের উপর। এ হাদীছটি আরও স্পষ্ট

৩৪* মুহিমনগর, চৈতনখিলা, শেরপুর।

৩৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৩২০।

৩৬. আদাবুল মুফরাদ, হা/৪৮১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৯৩৩, ১৩০১২, হাদীছটি গ্রহণযোগ্য।

www.al-itisam.com

করে অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি কোনো বৃক্ষরোপণ করে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে ওই বৃক্ষের ফলের সমপরিমাণ প্রতিদান দান করবেন’।[৩৭]

তাছাড়া রিযিকের উৎসমূল হলো গাছ। গাছ থেকে উৎপাদিত ফল-ফসল খেয়ে প্রাণীকুল জীবন ধারণ করে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ - فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ - وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ﴾ ‘আর আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমাণমত। অতঃপর তা যমীনে সংরক্ষণ করি। আর আমরা ওটাকে সরিয়ে নিতেও সক্ষম। অতঃপর আমরা তা দিয়ে তোমাদের খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি। তোমাদের জন্য সেখানে থাকে প্রচুর ফল-ফলাদি এবং তোমরা তা থেকে ভক্ষণ করে থাক। আর আমরা সৃষ্টি করেছি (যায়তূন) বৃক্ষ, যা সিনাই পর্বতে জন্মায়। যা থেকে উৎপন্ন হয় তৈল এবং ভক্ষণকারীদের জন্য রুচিকর খাদ্য’ *(আল-মুমিনূন, ২৩/১৮-২০)*।

রোপিত বৃক্ষের ফল চুরি হয়ে গেলেও তা ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে। কারো গাছের ফল অন্য কেউ না বলে খেলেও ছাদাক্বা হবে। রাসূল ﷺ বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ‘কোনো মুসলিম যদি বৃক্ষরোপণ করে, অতঃপর তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয়, তা তার জন্য ছাদাক্বাস্বরূপ; যা কিছু চুরি হয়ে যায়, তা ছাদাক্বা; হিংস্র পশু যা খেয়ে নেয়, তা ছাদাক্বা; সেখান থেকে পাখি যা খায়, তা ছাদাক্বা এবং কেউ ক্ষতি সাধন করলে সেটাও তার জন্য ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হয়’।[৩৮]

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ছাদাক্বার নেকী অর্জিত হয়। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ غَرَسَ غَرْساً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ آدَمِيٌّ وَلاَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً.

আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা তিনি দামেশকে বৃক্ষরোপণ করছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলল, আপনি এ কাজ করছেন, অথচ আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছাহাবী? তখন তিনি বললেন, আপনি ব্যতিব্যস্ত হবেন না। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এমন বৃক্ষরোপণ করল, যা থেকে কোনো মানুষ বা আল্লাহর কোনো সৃষ্টিজীব ভক্ষণ করল, তাতে তার জন্য ছাদাক্বা রয়েছে’।[৩৯]

৩৭. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৫৬৭।

৩৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৫২।

৩৯. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৭৫৪৬; ছহীহুল জামে‘, হা/৬৪০০।

বৃক্ষরোপণকে ‘ছাদাক্বায়ে জারিয়া’ বা প্রবহমান দান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ كَرَى نَهَرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلاً أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ‘মানুষের মৃত্যুর পর তার কবরে সাতটি নেক আমলের ছওয়াব জারি থাকে— (১) যে ব্যক্তি (উপকারী) ইলম শিক্ষা দিল বা (২) খাল-নালা প্রবাহিত করল অথবা (৩) কূপ খনন করল বা (৪) ফলবান বৃক্ষরোপণ করল অথবা (৫) মসজিদ নির্মাণ করল বা (৬) কুরআনের উত্তরাধিকারী বানাল অথবা (৭) এমন সুসন্তান রেখে গেল, যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে’।[৪০]

অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা উম্মু মা‘বাদের বাগানে প্রবেশ করেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে উম্মু মা‘বাদ! এ গাছ কে রোপণ করেছে? কোনো মুসলিম, না কাফের?’ সে বলল, মুসলিম রোপণ করেছে। তখন তিনি বললেন, فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ‘কোনো মুসলিম যদি বৃক্ষরোপণ করে আর তা থেকে মানুষ কিংবা চতুষ্পদ প্রাণী অথবা পাখি কিছু ভক্ষণ করে, তবে ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্য তা ছাদাক্বাস্বরূপ থাকবে’।[৪১]

নবী ﷺ অপ্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করাকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ ‘যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে কুল বৃক্ষ কর্তন করবে, আল্লাহ তাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন’।[৪২] আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বৃক্ষ কর্তনের ব্যাপারে সাবধান করেছেন। যেমন তিনি ইয়াযীদ ইবনে আবী সুফিয়ানকে শামে প্রেরণের সময় বিনা প্রয়োজনে কোনো ফলবান বৃক্ষ কর্তন করতে নিষেধ করেছিলেন। হাদীছে এসেছে, نَهَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَزِيدَ أَنْ يَقْطَعَ شَجَرًا مُثْمِرًا আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদকে কোনো ফলবান বৃক্ষ কাটতে নিষেধ করেছেন।[৪৩] যারা নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করবে, তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ ‘যখন সে ফিরে যায় (অথবা নেতৃত্বে আসীন হয়), তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্য ও প্রাণী বিনাশের চেষ্টা করে। অথচ আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না’ *(আল-বাক্বারা, ২/২০৫)*।

সুতরাং আমরা যেন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণী ধ্বংসের পাঁয়তারা করে আল্লাহর ক্রোধের শিকার না হই। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

৪০. বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৩১৭৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৭৩।

৪১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৫২; আহমাদ, হা/১৩০২২।

৪২. আবূ দাঊদ, হা/৫২৩৯; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৬১৪; মিশকাত, হা/২৯৭০।

৪৩. বায়হাক্বী, হা/১৮৬১৬; তিরমিযী, হা/১৫৫২, সনদ ছহীহ।

www.al-itisam.com



হারামাইনের মিম্বার থেকে

ঈমান ও নিরাপত্তা লাভ: পবিত্র জীবনের ভিত্তি

[২১ যুলক্বা'দাহ, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ৮ মে, ২০২৬ মদীনা মুনাওয়ারার আল-মাসজিদুল হারামে (মসজিদে নববী) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ আলী ইবনু আব্দুর রহমান আল-হুযায়ফী** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যাবতীয় প্রশংসা সেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল, প্রজ্ঞাময় ও কৃতজ্ঞতাপরায়ণ আল্লাহর জন্য। আমি আমার প্রতিপালকের দানকৃত জানা-অজানা সকল নেয়ামতের প্রশংসা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি অন্তরের গোপন বিষয়সমূহ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, যিনি সকল নেক ও কবুলযোগ্য আমলের দিকে আহ্বানকারী ও পথপ্রদর্শক। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সেই ছাহাবীদের উপর রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল করুন, যারা হেদায়াত ও নূরের অনুসরণ করেছেন।

অতঃপর, আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আনুগত্যপূর্ণ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এবং হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করুন; যাতে আপনারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত অর্জনে সফল হতে পারেন।

হে মুসলিমগণ! পৃথিবীতে ইসলাম এসেছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ইবাদতের মূলনীতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার জন্য। এছাড়াও, সৃষ্টির উপর আল্লাহর হক্ব, তাঁর রাসূল ﷺ-এর হক্ব এবং বান্দাদের একে অপরের প্রতি আবশ্যকীয় হক্বসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য।

যাতে একজন মুসলিম প্রকৃত অর্থে আল্লাহর বান্দা হতে পারে এবং মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম' *(আন-নিসা, ৪/৬৯)*। আলেমগণ বলেন, সৎকর্মশীল সেই ব্যক্তি হলো, যে আল্লাহর হক্ব এবং বান্দাদের হক্ব যথাযথভাবে আদায় করে। ফলে সে তাশাহহুদে মুছল্লীদের এই দু'আর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, 'হে আল্লাহ! আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ইবাদত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকটাত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে, যারা দাম্ভিক ও অহংকারী' *(আন-নিসা, ৪/৩৬)*। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে বলেন, এ সকল আয়াতকে আয়াতুল হুকূক্ব তথা অধিকারসমূহের আয়াত বলা হয়'। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর' *(আল-আহযাব, ৩৩/৬)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেন, 'মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তারা রাসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রাসূলের জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে' *(আত-তাওবা, ৯/১২০)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো' *(আল-আনফাল, ৮/১)*।

পৃথিবীতে ইসলামের বার্তা এসেছে নিরাপত্তা, শান্তি ও রহমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এ দ্বীন সর্বপ্রথম মুসলিমের নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে এবং ঈমানের ভিত্তিসমূহ সুদৃঢ় করেছে। মহান আল্লাহ বরেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলমের

www.al-itisam.com

সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(আল-আনআম, ৬/৮২)*।

সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান অর্জন করে আল্লাহ তাকে যুলম থেকে রক্ষা করেন আর সবচেয়ে বড় যুলম হলো বিভিন্ন প্রকার শিরক। আল্লাহ তাকে গুনাহের মাধ্যমে নিজের উপর যুলম করা ও মানুষের উপর অত্যাচার করা থেকেও রক্ষা করেন আর তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে। এটি আল্লাহ তাআলার এমন প্রতিশ্রুতি, যা কখনো ব্যর্থ হয় না। আর যার ঈমানে ঘাটতি থাকে এবং যে নিজের উপর বা অন্যের উপর কোনো যুলম করে, তার তাওহীদ ও সঠিক পথের উপর অবিচল থাকার ঘাটতির অনুপাতে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তি কমে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়। যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্য রয়েছে সুখময় জীবন ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল' *(আর-রা'দ, ১৩/২৮-২৯)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-ই সৎকাজ করবে, তাকে আমি অবশ্যই পবিত্র ও আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান প্রদান করব' *(আন-নাহল, ১৬/৯৭)*।

আর যখন মহান আল্লাহ কোনো দেশকে নিরাপত্তা ও শান্তির নেয়ামত দান করেন, তখন সেখানে দ্বীন প্রকাশ্য, শক্তিশালী ও সম্মানিত হয়ে ওঠে। ছালাত, জুমআ ও জামাআত যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্য, উপকার ও কল্যাণমূলক কার্যাবলি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে থাকে। মানুষ তাদের জীবন, সম্মান ও সম্পদের ব্যাপারে নিরাপত্তা অনুভব করে। তখন জনপদ উন্নত হয়, রাস্তাঘাট নিরাপদ হয়, শহরগুলোর মধ্যে যোগাযোগব্যবস্থা সুদৃঢ় হয় এবং বিভিন্ন দেশ মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আদান-প্রদান করতে সক্ষম হয়। জীবন-জীবিকা সহজ হয়ে যায়, সর্বত্র সমৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে, সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় এবং প্রত্যেকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে। সুতরাং নিরাপত্তার মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

আর যখন নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন সেখানে অকল্যাণ ও বিপর্যয় নেমে আসে। আল্লাহর কাছে আমরা নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি। নিরাপত্তা লাভ ইসলাম পূর্ণতা পাওয়ার অন্যতম নিদর্শন।

খাব্বাব ইবনু আরাত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোনো বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, (আমাদের জন্য কি) সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দু'আ করবেন না? তিনি বললেন, 'তোমাদের পূর্বের লোকদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও ছিল যাকে ধরে নিয়ে তার জন্য যমিনে গর্ত করা হতো, তারপর করাত এনে মাথায় আঘাত হেনে দুই টুকরা করে ফেলা হতো। লোহার শলাকা দিয়ে তার গোশত ও হাড্ডি খসানো হতো। এতদসত্ত্বেও তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারত না। আল্লাহর কসম! এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে, সানআ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে; অথচ সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না এবং নিজের মেষপালের জন্য বাঘের ভয় থাকবে। কিন্তু তোমরা তো তাড়াহুড়া করছ'।[৪৪] আর এ ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের প্রারম্ভেই, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আদী! তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ?' আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন, 'তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও; তবে দেখবে, একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীল মহিলা হীরা হতে রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না'। আদী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উষ্ট্রারোহী মহিলা হীরা হতে একাকী রওয়ানা হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে। অথচ সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করে না।[৪৫] এটি সেই ব্যাপক নিরাপত্তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যার দ্বারা মানবজাতি উপকৃত ও সুখী হয়েছিল।

তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি চাঁদকে উদিত করো নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের উপর। (হে চাঁদ!) আমার রব ও তোমার রব এক আল্লাহ'।[৪৬]

ইসলামের ইবাদতসমূহ কেবল নিরাপত্তার ছায়াতেই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর নিশ্চয়ই ছালাত পূর্ণ নিরাপত্তার অবস্থাতেই আদায় করা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের হেফাযত করো এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। কিন্তু যদি তোমরা ভয় কর, তবে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে (আদায় করে নাও)। এরপর যখন নিরাপদ হবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না' *(আল-বাক্বারা, ২/২৩৮-২৩৯)*।

আর যাকাতও কেবল নিরাপত্তার অবস্থাতেই আদায় করা সম্ভব। হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যখন তোমরা

৪৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪৩।
৪৫. ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৯৫।
৪৬. তিরমিযী, হা/৩৪৫১; মিশকাত, হা/২৪২৮, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

নিরাপদ হবে, তখন যে ব্যক্তি উমরার পর হজ্জ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে; তবে যে পশু সহজ হবে, তা যবেহ করবে' *(আল-বাক্বারা, ২/১৯৬)*।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা মাসজিদুল হারামে প্রবেশকারীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে বলেন, 'নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হেদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য। তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী' *(আলে ইমরান, ৩/৯৬-৯৭)*।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর প্রতিপালকের কাছে এই পবিত্র স্থানকে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ এবং ফল-ফসলে সমৃদ্ধ করে দেওয়ার দু'আ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার রব! আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন' *(ইবরাহীম, ১৪/৩৫)*।

আর মহান আল্লাহ উমরা পালনকারীদের নিরাপত্তার নেয়ামত দেওয়ার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করেছেন। তোমরা ইনশা-আল্লাহ নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, কারো মাথা মুণ্ডন করে এবং কারো চুল ছেঁটে; তোমরা থাকবে নির্ভয়' *(আল-ফাতহ, ৪৮/২৭)*। এ বিষয়ে আরও বহু আয়াত ও প্রমাণ বিদ্যমান। আর জান্নাত কেবল নিরাপত্তার কারণেই সুন্দর ও পরিপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা এতে প্রবেশ করো শান্তিসহ ও নিরাপদে' *(আল-হিজর, ১৫/৪৬)*।

আর নিরাপত্তা আল্লাহর প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আবশ্যক করে; যাতে আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ আরও বৃদ্ধি করেন এবং মানুষকে এমন গুনাহ ও পাপ থেকে সতর্ক থাকার তাওফীক্ব দান করেন, যা শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

কারণ নেয়ামত যখন কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হয়, তখন তা স্থায়ী থাকে; আর যখন তাতে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তখন তা দূর হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন' *(ইবরাহীম, ১৪/৭)*।

بارك اللهُ لي ولكم في القرآنِ العظيمِ، ونفعنا وإيَّاكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيمِ.

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং মুত্তাক্বীদের অভিভাবক। আমি শুকরগুজার বান্দাদের ন্যায় আমার প্রতিপালকের প্রশংসা করি এবং তাঁর সেই সকল নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যা আমরা জানি এবং যা আমরা জানি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও শক্তিধর। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশ্বস্ত বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর, মহান আল্লাহকে ভয় করে চলুন এবং সর্বদা তাঁর শুকরিয়া ও যিকিরে মশগূল থাকুন। কেননা আমাদের প্রতিপালকই সর্বাধিক অধিকার রাখেন যে, তাঁর আনুগত্য করা হবে, কখনো তাঁর অবাধ্যতা করা হবে না, তাঁকে স্মরণ করা হবে, কখনো তাঁকে ভুলে যাওয়া হবে না এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে, কখনো তাঁর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না।

হে মুসলিমগণ! আপনারা বরকতময় দিন ও সম্মানিত মুহূর্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই এগুলোকে সৎকর্মের মাধ্যমে পূর্ণ করুন এবং সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য সাধ্যানুযায়ী নেক আমল আগাম পাঠিয়ে দিন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা নিজেদের কল্যাণে উত্তম কাজ সামনে পাঠাও। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো এবং জেনে রেখো, নিশ্চয় তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও' *(আল-বাক্বারা, ২/২২৩)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আর তোমরা নিজেদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর প্রতিদানরূপে পাবে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-মুযযাম্মিল, ৭৩/২০)*।

হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আপনি সুস্থতার মধ্যে আছেন এবং সৎকর্ম করার সক্ষমতা রাখেন, ততক্ষণ আপনি আখেরাতের জন্য কাজ করতে থাকুন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এমন দুটি নেয়ামত আছে, যে দুটিতে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত। তা হচ্ছে সুস্থতা আর অবসর'।[৪৭] উবায়দুল্লাহ বিন মিহছান খাত্বমী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠির মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে প্রতিদিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে'।[৪৮]

৪৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬৪১২; তিরমিযী, হা/২৩২৪।
৪৮. তিরমিযী, হা/২৩৪৬।

www.al-itisam.com

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৭)

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

মুনাফেক্ব, ফাসেক্ব ইত্যাদির সাথে চলমান তর্ক-বিতর্কের মধ্যে মহান আল্লাহ কথাকে এমন এক দিকে ঘুরিয়ে দিলেন যা নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই। আস্তিক-নাস্তিক সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, মানুষকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনা হয়েছে। আর মানুষ একদিন মৃত্যুবরণ করবে। আর কীভাবে তোমরা মহান আল্লাহর কথাকে অমান্য করতে পার; অথচ তোমরা জান যে, তোমরা একসময় মাটি ও শুক্রকীটরূপে নির্জীব জড়-বস্তু ছিলে? মহান আল্লাহই মৃত মাটি ও মৃত শুক্রকীট থেকে তোমাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তোমাদের আবারও মৃত্যু দান করবেন এবং পুনরায় তোমাদের জীবিত করবেন। তথা সেই সত্তাই মানুষের জন্ম-মৃত্যুর অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক, যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই মহান আল্লাহ। মানুষের বিজ্ঞান যত উন্নতই হোক, মানুষকে কখনোই চিরঞ্জীব করতে পারবে না তথা মৃত্যুকে কখনোই বিজ্ঞান জয় করতে পারবে না। মানুষের এই অক্ষমতাই মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর পুনরায় মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে তথা মৃত্যুই শেষ নয়, বরং মৃত্যু মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার মাধ্যম মাত্র। যেহেতু মানুষের প্রথম সৃষ্টি আল্লাহর হাতে, আবার মানুষের মৃত্যুও আল্লাহর হাতে; সেহেতু মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন কিছু নয়। আর তিনি দ্বিতীয়বার মানুষের পুনরুত্থান ঘটাবেন এবং তাঁর নিকট হাশরে একত্রিত করবেন। যেহেতু দুনিয়াতে অনেকেই পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে থাকে, তাই মহান আল্লাহ বলেছেন, ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় কাফের হোক অথবা মুমিন হোক সকলকেই মহান আল্লাহর নিকট ফিরে যেতেই হবে। তাই মানুষের উচিত যার নিকট থেকে সে এসেছে, আবার যার নিকটেই ফিরে যাবে মধ্যবর্তী দুনিয়ার জীবনটাও তাঁর জন্য উৎসর্গ করা।

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

মহান আল্লাহ শুধু মানুষকে সৃষ্টি করার দাবি করে ক্ষান্ত হননি, বরং সমগ্র আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, এগুলো সবই তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই কথায় অনেক শিক্ষা আছে, প্রথমটি হচ্ছে মানুষের সম্মান। কেননা সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তথা সবই মানুষের খেদমতে নিয়োজিত। সবই মানুষের উপকারে আসবে। মাটির নিচের খনিজ থেকে শুরু করে নদী-নালা, মেঘমালা, সূর্য-তারকা সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি মানুষের জন্য যেমন সম্মানের, তেমনি মানুষের জন্য আমানত ও দায়িত্ব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পৃথিবীর কোনো কিছুরই মালিক মানুষ নয়। মানুষ ব্যবহার করলেও, উপকার নিলেও, সাময়িক সময় নিজ মালিকানায় রাখলেও সবকিছুর চিরস্থায়ী মালিক শুধু মহান আল্লাহ। আর এই জন্যই আল্লাহ যখন যমীনে ভূমিকম্প দেন, ঝড়-বৃষ্টি দেন এগুলো মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষ সম্ভাব্য আগাম তথ্য দিতে পারে, এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি থেকে যতটুকু সম্ভব নিজেকে বাঁচাতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আটকাতে পারে না। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ মহান আল্লাহর হাতে থাকার কারণেই মানুষ শূন্য থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রূপান্তর ঘটাতে পারে। যেমন আজকের ধানগুলো গত বছরের ধানের চারা থেকে এসেছে, সেগুলো তার আগের বছরের ধান থেকে এসেছে। এভাবে সর্বপ্রথম ধান মানুষ সৃষ্টি করেনি, বরং মহান আল্লাহ করেছেন। মানুষ শুধু নতুন নতুন গবেষণার দিয়ে তার মধ্যে রূপান্তর করছে। অতএব, তোমরা কীভাবে সেই আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার, যিনি যমীনের সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন? যদিও এই পৃথিবীর নেয়ামতরাজিই ঈমান আনয়নের জন্য যথেষ্ট, তবুও তোমাদের জানা উচিত যে, তোমাদের দৃষ্টিগোচর ও ব্যবহার্য এই যমীনের চেয়েও শতগুণ আশ্চর্য এক অদৃশ্য আসমানী জগৎ রয়েছে, যা মহান আল্লাহরই সৃষ্টি। যমীন সৃষ্টির পর তিনি আসমানের দিকে সমুন্নত হয়েছেন এবং আসমানকে সাত স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। আর তিনি আসমান ও যমীনের মধ্যকার সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

৪৯* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

www.al-itisam.com

খুলুকুল মুসলিম

উলামায়ে কেরামের সাথে একজন মুসলিমের আচরণ

মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান*

ইসলামে উলামায়ে কেরামের মর্যাদা অত্যন্ত মহান। তারা নবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর উত্তরসূরি এবং দ্বীনের জ্ঞান মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উলামায়ে কেরামের প্রতি একজন মুসলিমের কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত—এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উলামায়ে কেরামকে ভালোবাসা। কেননা তাঁরা নবীগণ আলাইহিমুস সালাম-এর উত্তরসূরি। যেমনটি ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

২. তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ঈমান রাখা এবং বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলার নিকট তারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

৩. উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে আলেমদের সম্মান করা এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করা।

৪. তাদের থেকে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আগ্রহী থাকা।

৫. কোনো আলেম ভুল করলে সে কারণে তার নিন্দা না করা।

৬. আলেমদের গীবত করা বা তাদের নিয়ে উপহাস করা হারাম।

৭. আলেমদের সাক্ষাতে যাওয়া বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উপযুক্ত সময় নির্বাচন করা।

৮. তাদের নিকট প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার বজায় রাখা।

৯. ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য তারা যে অবদান রেখেছেন, তার প্রতিদানে তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করা।

১০. তাদের শিক্ষা ও উপদেশ সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার করা।

১১. যেসব বিষয়ে তাদের বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহসম্মত, সেসব বিষয়ে তাদের অনুসরণ করা।

১২. এটা মনে রাখা যে, আলেমগণ নিষ্পাপ নন; বরং অন্যান্য মানুষের মতো তারাও ভুল করেন, রাগ করেন এবং ভুলে যান। তবে এটাও জানা উচিত যে, তাদের ভালো কাজ তাদের ভুলের তুলনায় অনেক বেশি।

১৩. মানুষ যখন তাদের কষ্ট দেয় বা আঘাত করে, তখন যথাযথভাবে তাদের পক্ষ সমর্থন করা এবং মর্যাদা রক্ষা করা।

১৪. তাদের থেকে কোনো ফতওয়া বা মতামত শুনলে তা যাচাই-বাছাই করা।

১৫. তারা কোনো ভুল করলে তা শালীন ভাষায় ও সম্মানের সঙ্গে তাদের জানানো।

১৬. তাদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা।

১৭. তারা যদি কোনো কারণে কটুকথা বলেন বা ভর্ৎসনা করেন, তবে তা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করা।

১৮. তাদের প্রতি আস্থা রাখা এবং শত্রুদের কথায় তাদের সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ না করা।

১৯. তাদের সম্মানসূচক উপাধিতে সম্বোধন করা।

একজন মুসলিমের কর্তব্য হলো উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান, আদব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তাদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং দ্বীনের বিষয়ে তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা একজন মুমিনের ঈমানী দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে তাদের বক্তব্য যাচাই করাও জরুরী। আলেমদের মর্যাদা রক্ষা, তাদের থেকে উপকৃত হওয়া এবং তাদের জন্য দু'আ করা মুসলিম সমাজে ঐক্য, জ্ঞান ও দ্বীনের সঠিক চর্চা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৫০*অধ্যয়নরত, কুল্লিয়্যাহ ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

ফাযায়েলে আমল

মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, বায়তুল মাক্বদিস ও মসজিদে কুবায় ছালাত আদায়ের ফযীলত

-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)*

১. মক্কার মসজিদে হারামে ছালাত আদায়ের ফযীলত:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاه.

জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমার এই মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্য মসজিদের তুলনায় ১ হাজার গুণ উত্তম, তবে মক্কার মসজিদে হারাম ব্যতীত। মসজিদে হারামে ছালাত আদায় অন্য যে কোনো মসজিদে ছালাতের চেয়ে ১ লক্ষ গুণ বেশি ছওয়াব রয়েছে’।[৫২]

২. মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের ফযীলত:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الحَرَامَ.

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমার এই মসজিদে ছালাত আদায় করা অন্য মসজিদের তুলনায় ১ হাজার গুণ উত্তম, তবে মক্কার মসজিদে হারাম ব্যতীত’।[৫৩]

৩. বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায়ের ফযীলত:

আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একদা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করেন, বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায় উত্তম, না রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মসজিদে ছালাত আদায় করা উত্তম? তখন তিনি বলেন, صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ ‘বায়তুল মাক্বদিসে ছালাত আদায়ের মর্যাদা আমার এই মসজিদে ছালাতের চতুর্থাংশ’।[৫৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلاَّ يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) যখন বায়তুল মাক্বদিস তৈরির কাজ শেষ করেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেন— ১. সুবিচার, যা আল্লাহর হুকুমের অনুরূপ; ২. এমন রাজত্ব, যা তাঁর পরে কাউকে দেওয়া হবে না এবং ৩. যে ব্যক্তি শুধু ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বায়তুল মাক্বদিসে আগমন করবে, সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের দিন নিষ্পাপ ছিল’। এরপর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘প্রথম দুটি তাকে দান করা হয়েছে এবং আশা করি তৃতীয়টিও তাকে দান করা হবে’।[৫৫]

৪. মসজিদে কুবায় ছালাত আদায়ের মর্যাদা:

মহান আল্লাহ সেই মসজিদের প্রশংসা করে বলেন, ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ ‘তুমি সেখানে কখনো (ছালাত ক্বায়েম করতে) দাঁড়াবেন না। অবশ্যই যে মসজিদ প্রথম দিন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর, তা বেশি হক্বদার যে, আপনি সেখানে ছালাত ক্বায়েম করতে দাঁড়াবেন। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন’ *(আত-তাওবা, ৯/১০৮)*।

قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

সাহল ইবনু হুনায়ফ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন (ওযূ) করার পর মসজিদে কুবায় গিয়ে (দুই রাকআত) ছালাত আদায় করে, তার জন্য একটি উমরা করার ছওয়াব রয়েছে’।[৫৬]

শিক্ষা: যে মুসলিমের সামর্থ্য আছে, তার উচিত এসব মসজিদে বেশি বেশি সফর করা। কেননা এর মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার দেওয়া নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারবে।

৫১*শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৫২. ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৬, হাদীছ ছহীহ; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৬৯৪।

৫৩. ছহীহ বুখারী, হা/১১৯০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৯৪।

৫৪. বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান, হা/৩৮৪৯; আলবানী, মাওসূআতুল ই‘তিক্বাদ, ২/২৫৩।

৫৫. ইবনু মাজাহ, হা/১৪০৮, হাদীছ ছহীহ।

৫৬. ইবনে মাজাহ, হা/১৪১২।

www.al-itisam.com

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ছালাতে সুতরা ও তার সুন্নাতসমূহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ছালাতের অনেক সুন্নাত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো সুতরা গ্রহণ। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. সুতরা গ্রহণ করা সুন্নাত:

ইমাম ও একাকী ছালাত আদায়কারীর জন্য সুতরা গ্রহণ করা সুন্নাত। আর ইমামের সুতরাই হচ্ছে মুক্তাদীর সুতরা। আবূ সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে মারফূ‘সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করে, সে যেন সুতরা গ্রহণ করে...’।[৫৭]

সুতরা গ্রহণ করা যে সুন্নাত, এ ব্যাপারে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাট, প্রাচীর, গাছের ডাল, কাঠ, বর্শা, বল্লম ও উষ্ট্রীবাহন ইত্যাদি বস্তুকে সুতরা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করার আশঙ্কা থাকা বা না থাকা সত্ত্বেও বিল্ডিংয়ে বা ফাঁকা ময়দানে, সফরে কিংবা মুক্বীম অবস্থায় সুতরা গ্রহণ করা সুন্নাত। কেননা এ সংক্রান্ত হাদীছে বিল্ডিং ও ফাঁকা ময়দানের মাঝে কোনো পার্থক্য উল্লেখ নেই। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফর ও মুক্বীম সর্বাবস্থায় সর্বদা সুতরা গ্রহণ করতেন। যেমনটি আবূ জুহায়ফার হাদীছে বর্ণিত রয়েছে।[৫৮]

২. সুতরা কাছাকাছি রাখা সুন্নাত:

সুতরা এবং সিজদার মাঝ দিয়ে ছাগল অতিক্রম করতে পারে এতটুকু পরিমাণ সুতরা কাছাকাছি রাখা সুন্নাত। সাহল ইবনু সা‘দ সাঈদী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছালাতের স্থান ও দেয়ালের মাঝে একটা বকরি চলার মতো ব্যবধান ছিল।[৫৯] ‘ছালাতের স্থান’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সিজদা করার জায়গা। মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাঊদের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সুতরার মাঝে তিন হাত পরিমাণ জায়গা থাকত।[৬০]

৩. মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেওয়া সুন্নাত:

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যদি সামনে সুতরা রেখে ছালাত আদায় করে আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তাহলে সে যেন তাকে বাধা দেয়। যদি সে বাধা না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুছল্লী) যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা সে শয়তান’।[৬১]

যদি মুছল্লীর সামনে দিয়ে কোনো মহিলা, কালো কুকুর বা গাধা অতিক্রম করে; তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে তাকে বাধা দেওয়া আবশ্যক। কেননা এই তিন শ্রেণির কেউ ছালাতের সামনে অতিক্রম করে চলে গেলে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে। যেমনটি ছহীহ মুসলিমে আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। তবে মহিলা, কালো কুকুর বা গাধা ছাড়া অন্য কিছু অতিক্রম করে চলে গেলে ছালাত নষ্ট হবে না। এই অভিমতটিকে শায়খ ইবনু উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৪. প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত:

যেসব স্থানে মিসওয়াক করার গুরুত্বারোপ করা রয়েছে, এটা তার তৃতীয় স্থান। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম, তাহলে আমি প্রত্যেক ছালাতের সময় তাদের মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম’।[৬২]

৫৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৫।
৫৮. ছহীহ বুখারী, হা/৫০১; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৩।
৫৯. ছহীহ বুখারী, হা/৮৯৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৮।
৬০. মুসনাদে আহমাদ, হা/৬২৩১; আবূ দাঊদ, হা/২০২৪, হাদীছ ছহীহ।
৬১. ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৫।
৬২. ছহীহ বুখারী, হা/৮৮৭।

www.al-itisam.com

বিশ্বকাপ ফুটবল: বিনোদনের আড়ালে ঈমান বিধ্বংসী সংস্কৃতি?

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে আবারও উত্তেজনায় কাঁপছে পুরো পৃথিবী। এবারের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোতে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সংবাদমাধ্যম ও বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বকাপের জ্বর ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। অলিগলি থেকে শুরু করে ফেসবুক, এক্স, ইউটিউব—সবখানেই এখন বিভিন্ন দলের সমর্থন, পতাকা, জার্সি এবং খেলোয়াড়দের নিয়ে উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু একজন মুসলিম হিসেবে আমরা এই বিশ্বকাপের সঙ্গে কতটুকু সম্পৃক্ত হতে পারি? আজ ফিতনার এই যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের নিজেদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা উচিত—এই উন্মাদনা কি শুধু খেলাধুলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নাকি ধীরে ধীরে এটি আমাদের ঈমান, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির উপরও প্রভাব ফেলছে?

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও আমাদের ঈমান-আক্বীদা এখনো পুরোপুরি ইসলামের আলোকে গড়ে ওঠেনি। ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতি, বিধর্মীদের জীবনাদর্শ এবং তাদের প্রতীকগুলো আমরা সহজেই গ্রহণ করে নিচ্ছি। আজ বিশ্বকাপের নামে আমরা এমন অনেক কাজ করছি, যা একজন মুমিনের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বিশ্বকাপ: একটি বৈশ্বিক সংস্কৃতি

বর্তমান যুগে ফুটবল শুধু একটি খেলার নাম নয়, এটি এখন এক বিশাল সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার কোটি ডলারের ব্যবসা, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন, বিনোদন এবং পশ্চিমা জীবনাদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

বিশেষ করে এবারের বিশ্বকাপ যেহেতু আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই পশ্চিমা উদারবাদী সংস্কৃতির প্রচারণা আরও ব্যাপকভাবে সামনে আসাটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব প্রকাশ্যে LGBTQ মতবাদ (LGBTQ একটি সংক্ষিপ্ত রূপ, যা বিভিন্ন যৌন অভিমুখিতা ও লিঙ্গ পরিচয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে এর অর্থ হলো L=Lesbian, G=Gay, B=Bisexual, T=Transgender ও Q=Queer/Questioning), উন্মুক্ত সম্পর্ক, বেপর্দা সংস্কৃতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থাকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। বড় বড় ক্রীড়া আয়োজনগুলোও এখন এসব মতাদর্শ প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ অনেক ফুটবল ক্লাব, খেলোয়াড় এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রকাশ্যে সমকামিতার প্রতীক ব্যবহার করছে, Rainbow Campaign-এ অংশ নিচ্ছে এবং পশ্চিমা সামাজিক মতাদর্শকে সমর্থন করছে। অথচ অনেক মুসলিমও তাদেরকে আদর্শ মনে করে অজান্তেই এসব প্রচারণাকে সমর্থন করছে।

ইসলাম কী বলে?

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ 'হে মুমিনগণ! ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু' *(আল-মায়েদা, ৫/৫১)*। অন্য আয়াতে তিনি আরও বলেছেন, ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ 'মুমিনগণ যেন মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে' *(আলে ইমরান, ৩/২৮)*।

অর্থাৎ মুসলিমদের কখনোই ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো বিধর্মীর সঙ্গে আন্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত নয়, শুধু সামাজিক ও একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া। এ বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট সীমারেখা ও কঠোর বিধান রয়েছে।

অনেকেই বলেন, খেলা সমর্থন করলেই কি বন্ধুত্ব হয়ে যায়? কিন্তু বাস্তবতা হলো প্রথমে সমর্থন, তারপর ভালোবাসা, আর ভালোবাসা থেকেই আসে অনুসরণ ও অনুকরণ। এভাবেই ধীরে ধীরে তাদের সঙ্গে হৃদ্যতা তৈরি হয়। আজ আমরা বিভিন্ন দেশের জয়-পরাজয়ে হাসছি-কাঁদছি, খেলোয়াড়দের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়া বা বাগবিতণ্ডায় লিপ্ত হচ্ছি। এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনেও পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত ও বিরোধে জড়িয়ে পড়ছি। এগুলো কি নিছক ছেলেখেলা?

যখন কোনো ব্যক্তির প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার জীবনধারা, পোশাক, আচরণ ও চিন্তাভাবনার প্রতিও আকর্ষণ তৈরি হয়। এ কারণেই আজ আমাদের দেশে মেসি, রোনালদো, নেইমারসহ বিভিন্ন নামিদামি খেলোয়াড়কে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা যায়। আর এভাবেই ধীরে ধীরে আমরা পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি।

৬৩* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

www.al-itisam.com

অনুকরণ ও অনুসরণের ভয়াবহতা:

ফুটবল বিশ্বকাপ এলেই দেখা যায়, বিদেশি পতাকায় ছেয়ে যাচ্ছে পুরো শহর। বিধর্মী দেশগুলোর জার্সি পরে মুসলিম ছেলে-মেয়েরা গর্বভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকেই কাফের-মুশরিক খেলোয়াড়দের হেয়ারস্টাইল, ফ্যাশন ও জীবনধারার অনুসরণে নিজেদের সাজাচ্ছে। রাত জেগে খেলা দেখতে গিয়ে অবহেলিত হচ্ছে ছালাত ও অন্যান্য ইবাদত। এমনকি খেলাকে কেন্দ্র করে পাড়া-মহল্লায় গালাগালি, ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতার পরিবেশও তৈরি হচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৬৪] অর্থাৎ কেউ যদি কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর অনুসরণ করে, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে সেই জাতি বা গোষ্ঠীর সঙ্গেই গণ্য করা হবে। এই হাদীছ শুধু পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি ও আদর্শগত অনুসরণের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক করে।

আজ অনেক মুসলিম বিভিন্ন দলের খেলোয়াড়দের জীবনধারা অনুসরণ করছে। অথচ সেই খেলোয়াড়দের বড় একটি অংশের জীবন হারাম সম্পর্ক, উল্কি, মদ্যপান, বেপর্দা সংস্কৃতি এবং ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ। একজন মুসলিমের আদর্শ হওয়া উচিত রাসূলুল্লাহ ﷺ, ছাহাবায়ে কেরাম এবং নেককার মানুষদের জীবন। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে আজ উম্মাহর বহু তরুণের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে বিধর্মী ফুটবল তারকা ও সেলিব্রিটিরা।

বিশ্বকাপ উন্মাদনায় ঈমানের দুর্বলতা:

বর্তমানে বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক নষ্ট হয়, সামাজিক মাধ্যমে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার হয়, মুসলিমরা বিভিন্ন জাতীয়তাবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে, সময় ও অর্থের অপচয় হয়, অনেকেই ছালাত বা ইবাদত থেকে গাফেল হয়ে যায়। আর সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো এসবকে এখন 'স্বাভাবিক' মনে করা হয়। অথচ একজন মুমিনের হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও আখেরাতের চিন্তা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'মানুষ যার সাথে ভালোবাসা রাখবে, (ক্বিয়ামতের দিন) সে তার সাথেই থাকবে'।[৬৫] তাহলে আমরা একবার চিন্তা করি, আসলে আমরা কাদেরকে ভালোবাসছি?

রাসূল ﷺ -এর কথা সত্য প্রমাণিত:

হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি পুরোপুরি অনুসরণ করবে প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তেও ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাতে ঢুকবে'।[৬৬]

বর্তমানে আধুনিক মুসলিমদের পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুসরণ দেখে এই হাদীছের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলিমরা আজ ইসলামী পরিচয়ে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু বিধর্মীদের পতাকা নিয়ে রাস্তায় মিছিল করতে লজ্জা পায় না। দাড়ি, হিজাব ও সুন্নাহকে 'ব্যাকডেটেড' মনে করা হয়; অথচ ফুটবল তারকাদের স্টাইলকে 'স্মার্টনেস' মনে করে। আর এভাবেই আমরা বিধর্মীদের অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরে জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অথচ প্রায় ১৪০০ বছর আগেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের এ ধরনের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

মুসলিমদের করণীয় কী?

চারদিকে নানাবিধ ফিতনার এই যুগে আমাদের ঈমান ও আমল রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের উচিত নিজেদের ঈমান ও আক্বীদা সংরক্ষণ করা এবং বিধর্মীদের অন্ধ অনুসরণ থেকে দূরে থাকা। কোনোভাবেই খেলাধুলাকে জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত করা উচিত নয়।

শৈশব থেকেই কোমলমতি শিশুদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের মূল্যবান সময় ইবাদত, জ্ঞানার্জন ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা উচিত।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম বৈধ বিনোদনকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেনি। তবে এমন কোনো বিনোদন বৈধ নয়, যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, হারাম সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট করে কিংবা ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে।

শেষকথা:

আজ বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ যে উন্মাদনায় ডুবে যাচ্ছে, তা নিছক খেলার আবেগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়, চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও ঈমানের ওপরও প্রভাব ফেলছে।

অতএব, আমাদের উচিত আবেগের পরিবর্তে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের জীবনকে যাচাই করা। কারণ দুনিয়ার সাময়িক উল্লাস নয়, বরং আখেরাতের সফলতাই একজন মুমিনের প্রকৃত লক্ষ্য। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং ঈমানের উপর অটল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৬৪. আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১।
৬৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৭০।
৬৬. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৯।

www.al-itisam.com

নারীদের পাতা

ইসলামে নারীর হিজাবের বিধান ও তার যৌক্তিকতা

-আয়েশা হুমায়রা*

আমাদের জীবনব্যবস্থা ইসলাম নারীদের এক অনন্য মর্যাদা প্রদান করে। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনধারার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানোর জন্য নানা কথা বলে থাকে। ইসলামে নারীদের সম্পর্কে কিছু বিষয় রয়েছে, যা অনেকের কাছে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ একটা প্রশ্ন হচ্ছে, হিজাব কি নারী উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না? বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা হিজাব সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোকপাত করব।

লক্ষ লক্ষ মানুষ একই প্রশ্ন তোলে— এই হিজাব বা পর্দার বিধান কি বড় কোনো বিধিনিষেধ নয়?

সেক্যুলার মতবাদ ধারণকারী দেশি ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে হিজাবকে প্রায়ই নিপীড়ন বা সীমাবদ্ধতার প্রতীক হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়। তারা অনেক সময় মুসলিমবিশ্বকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরে উপস্থাপন করে। তাদের দৃষ্টিতে নারীর পোশাকের স্বাধীনতা যেন খোলামেলা পোশাক পরিধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ!

এই তথাকথিত সেক্যুলার সমাজে, বিশেষ করে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন ঘটনাও দেখা যায়, যেখানে একটি দল মিলে কোনো নারীকে শুধু হিজাব পরার কারণে হেনস্তা করে। কখনো কখনো শ্রেণিকক্ষেও শিক্ষকেরা হিজাব পরার জন্য শিক্ষার্থীদের বিব্রত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, শুধু বোরকা-হিজাব পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কারণে তাকে ক্লাস টিচার থেকে শুরু করে সিনিয়রদের কাছ থেকেও নানা ধরনের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে।

এছাড়া প্রায়ই শোনা যায়, স্কুলে পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের নিকাব খুলতে বাধ্য করা হয়।

কিছুদিন আগে ভারতের গণমাধ্যমে একটি ভিডিও বেশ ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, এক মন্ত্রী একজন হিজাবী নারীকে পুরস্কৃত করার সময় হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার নিকাব টেনে নামিয়ে দেন, আর ঘটনাটি ঘটে গণমাধ্যমের সামনেই। এটাকেই কি নারীর স্বাধীনতা বলা যায়?

ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের নৈতিকতা বা মূলনীতি ভিন্ন হতে পারে, তবে সেই নৈতিকতা তার ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। আপনি কি কখনো দেখেছেন, কোনো আলেম রাস্তায় খোলামেলা পোশাক পরিহিত কোনো নারীকে এ কারণে তিরস্কার করছেন? সাধারণত এসব ক্ষেত্রে আলেমরা নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখেন এবং স্থান ত্যাগ করেন।

হ্যাঁ, এটা বলা যায় যে, আলেম-উলামা ওয়ায মাহফিলে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীছের আলোকে যুক্তিপূর্ণভাবে হিজাবের গুরুত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরেন। এভাবেই তারা সমাজ সংস্কারের কাজ করে থাকেন।

আর হিজাবের বিধান এমন একটি বিষয়, যা অনেক অমুসলিম নারীকে ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিষয়টি শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, বাস্তবে তা সত্য।

একটি ইসলামী গণমাধ্যম সম্প্রতি পাশ্চাত্যের কয়েকজন ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত নারীর কাছে জানতে চেয়েছিল যে, তাদের মুসলিম হওয়ার পেছনে কী প্রেরণা কাজ করেছে এবং হিজাব গ্রহণের কারণ কী? একই সঙ্গে প্রশ্ন রাখা হয়, হিজাব কি তাদের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে?

তাদের উত্তরগুলো ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং হিজাব সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। নিচে তাদের অভিমতগুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হলো—

(১) আলিয়া উম্মে রাইয়ান, একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম নারী। তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছেন। তার মতে, স্বাধীনতার অর্থ হলো মানুষের আরোপিত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া। যখন একজন মানুষ সত্যিকার অর্থে স্রষ্টার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং নিজের জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে, তখন সে স্রষ্টার জন্যই বাঁচতে শেখে; অন্যের জন্য নয়। আর তার দৃষ্টিতে এটিই প্রকৃত স্বাধীনতা। তিনি আরও বলেন, তিনি এখন হিজাব পরেন এবং এতে কিছু বিধিনিষেধ অবশ্যই রয়েছে, যা তিনি তার পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্য পালন করেন। তবুও তিনি নিজেকে স্বাধীন মনে করেন; কারণ তার সিদ্ধান্ত, তার পছন্দ, কোথায় যাবেন, কী করবেন বা কী করবেন না— সবকিছুই তিনি তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য নির্ধারণ করেন। তিনি তার জীবনধারা অন্যদের অনুসরণে গড়ে তোলেন না, যারা ভিন্ন পথে চলছে। তিনি বলেন, আমি হিজাবী আর আমি মুক্ত।

৬৭* মিরপুর, ঢাকা।

www.al-itisam.com

(২) নাহেলা মোরালিস, একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম নারী। তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত মুক্তির স্বাদ অনুভব করেছেন। তার ভাষায়, হিজাব পরার পর তিনি মনে করেছেন যে, এটি তাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করেছে। কে তাকে দেখবে আর কে দেখবে না, সেই সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই নিতে পারেন এবং এখন তার নিজের ওপর সেই অধিকার রয়েছে। তিনি আরও বলেন, তিনি নিজেকে কোনো বিলবোর্ডের মতো ভাবেন না, যেখানে মদ বিক্রির জন্য একজন নারীকে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হয়। তার কাছে সেটাই প্রকৃত নিপীড়ন। আর হিজাব তাকে সেই ধরনের নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিয়েছে।

(৩) আয়েশা রোযালি, একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম নারী, যিনি পূর্বে একজন ব্রিটিশ অভিনেত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, শুরুতে বিষয়টি তার জন্য সহজ ছিল না। কারণ একসময় তিনি এমন একজন ছিলেন, যিনি রাস্তায় বের হতে চাইতেন পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, মানুষ যেন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়, বারবার তার দিকে তাকায়। তবে একই সঙ্গে যখন কোনো অসৎ দৃষ্টির মানুষ তাকাত, তখন তা তাকে অস্বস্তি দিত এবং বিরক্ত করত। ইসলাম গ্রহণের পর তাকে সেই মানসিকতা পেছনে ফেলে আসতে হয়েছে, যা তার জন্য মোটেও সহজ ছিল না। তিনি আরও বলেন, একসময় তার পরিচয়ই যেন নির্ভর করত মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে কি-না, তার ওপর। তাই প্রথমবার যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় হিজাব পরে হাঁটছিলেন, তখন তার মনে হয়েছিল তার অস্তিত্ব যেন আড়ালে চলে গেছে, যেন তিনি সবার কাছে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

তিনি একসময় অভিনয় জগতে যেতে চেয়েছিলেন, বিশেষ ধরনের পোশাক পরতেন এবং আগে কখনো হিজাব বা নিজেকে আড়ালে রাখার কথা ভাবেননি তার জন্য এই পরিবর্তন ছিল বিরাট ব্যাপার। ইসলাম গ্রহণের পর তার জীবনধারা ও ব্যক্তিত্বে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। তিনি বলেন, শুরুতে যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অনুভূতি তাকে কষ্ট দিত, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটিই তার কাছে প্রশান্তির হয়ে ওঠে। তিনি রাস্তায় হাঁটা উপভোগ করতে শুরু করেন, যেই হাঁটা শুধু নিজের জন্য এবং কাউকে কিছু দেখানোর জন্য নয়। মানুষের দৃষ্টি বা মন্তব্য নিয়ে ভাবনা না করেই তিনি প্রথমবারের মতো জীবনকে উপভোগ করতে পেরেছেন। তার ভাষায়, 'হ্যাঁ, এই অনুভূতিটাই ইসলাম আমাকে দিয়েছে'।

(৪) আয়েশা মার্সিডিয (একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম নারী), যিনি ইস্ট লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন ও বেড়ে উঠেন। তিনি একসময় নিজেকে নাস্তিক হিসেবে ভাবতেন। তিনি বলেন, যখন কেউ মুসলিম হওয়ার কথা ভাবেন, তখন প্রথমেই তার উচিত আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার দিকে মনোযোগ দেওয়া। হিজাব একটি প্রক্রিয়ার অংশ, যার মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে কেন চুল ঢাকতে হয়, কেন শরীর আবৃত রাখতে হয় এবং কেন কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন, যারা ইসলাম গ্রহণের কথা ভাবছেন, কিন্তু দ্বিধায় আছেন, যেমন- আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ মেনে চলতে চাই; কিন্তু হিজাব পরতে বা কিছু অভ্যাস ছাড়তে প্রস্তুত নই— তাদের জন্য এ অনুভূতিগুলো একেবারেই স্বাভাবিক। ইসলাম গ্রহণের শুরুর দিকে এমন দ্বিধা থাকতেই পারে, তবে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হলে পরিবর্তনও আসতে শুরু করে।

নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, এমন অনেক বিষয় ছিল, যা তিনি কখনো কল্পনাও করেননি— পর্দা করা বা পার্টি-সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকা তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু যতই তিনি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করেছেন এবং ইসলামকে জানতে শুরু করেছেন, ততই স্বাভাবিকভাবে তার মনে হয়েছে যে, তিনি তার রবকে সন্তুষ্ট করতে চান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলাই তার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তার রহমত, ভালোবাসা ও সত্তাকে অনুভব করা জরুরী। মানুষকে সময় নিয়ে বুঝতে হবে যে, সে কার ইবাদত করছে এবং কেন করছে। ধীরে ধীরে এই উপলব্ধি মানুষকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়।

এ প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, একজন নাস্তিকও কি হিজাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, সেটি সম্ভব। কারণ শালীনতা ও নিজেকে আড়াল করে রাখা অনেক ক্ষেত্রে মানবিক স্বভাবের অংশ। অনেকে ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়াও ব্যক্তিগত বা সামাজিক কারণে হিজাব পালন করতে পারেন। তিনি আরও বলেন, স্বভাবগতভাবে একজন নারী এমন একজন পুরুষকে খোঁজেন, যার সঙ্গে তিনি নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও সুখ অনুভব করেন। একইভাবে একজন পুরুষও তার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস রাখতে চান এবং একটি আত্মিক প্রশান্তির বন্ধন গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। পারিবারিক সুখ-শান্তি বজায় রাখতে এই পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একারণেই পারিবারিক পরামর্শদাতারাও একটি সুস্থ দাম্পত্য জীবনের জন্য পরস্পরের প্রতি আনুগত্য, আস্থা ও সম্মানকে অত্যাবশ্যক বলে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। একটি সুস্থ বিবাহের জন্য পরস্পরের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন।

আর এক্ষেত্রেই ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দার বিধান এর মাধ্যমে সমাধান নিয়ে এসেছে। সূরা আন-নূরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(আন-নূর, ২৪/৩০)*। আর তার পরের আয়াতে বলেন, ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

www.al-itisam.com

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ‘আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায়, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার’ *(আন-নূর, ২৪/৩১)*।

লক্ষ করুন! পর্দার নির্দেশ আগে পুরুষদের দেওয়া হয়েছে আর বলা হয়েছে তাদের দৃষ্টি নত রাখতে। আর পুরুষদের দৃষ্টি নত রাখাই তাদের হিজাব।

এখানে আমরা একটি দ্বিমুখী সতর্কতা অবলোকন করছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরিবার রক্ষার নিমিত্তে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং তাঁর বান্দাদের সুখ সংরক্ষিত করতেও ব্যবস্থা দিয়েছেন; কিন্তু বর্তমানে নারী-পুরুষ উভয় প্রকারের হিজাব নিরন্তর আক্রমণের শিকার হচ্ছে।

এখন আমরা আলোচনা করব— ইসলামপ্রদত্ত এই সুরক্ষামূলক বিধানব্যবস্থা যদি কোনো পরিবার বা সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়, তবে তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হতে পারে?

এমন পরিস্থিতিতে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আনুগত্য ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। স্বভাবগতভাবেই অধিকাংশ নারীর মধ্যে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা এবং প্রশংসা পাওয়ার একটি প্রবণতা থাকে।

যখন এই সহজাত প্রবণতাসম্পন্ন কোনো নারী হিজাব ছাড়া বাইরে বের হন, তখন তার সামনে সাধারণত দু’টি পথ উন্মুক্ত থাকে—

(ক) তিনি নিজেকে মার্জিত ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন তথা পোশাক, আনুষঙ্গিক উপকরণ, চুলের সাজ এবং দৈহিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে। অথবা (খ) তিনি উদাসীন ও অনাকর্ষণীয়ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবেন।

এ দুই অবস্থার মাঝামাঝি কোনো অবস্থান বাস্তবে খুব একটা দেখা যায় না। স্বভাবগত কারণেই মানুষ নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে এবং প্রশংসা পেতে আগ্রহী থাকে। ফলে বাইরে বের হওয়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই অনেকেই চেষ্টা করেন নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে।

এখানে একটি প্রশ্ন সামনে আসে, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া কত শতাংশ পুরুষ এমনভাবে চিন্তা করেন যে, আমার সামনে দিয়ে যাওয়া এই নারী অন্য কারও স্ত্রী বা পরিবারের সদস্য হতে পারেন, তাই তার দিকে দৃষ্টি সংযত রাখা উচিত? এর উত্তর জানতে চাইলে কেউ নিজেই সামাজিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারণা নিতে পারেন।

এ ধরনের একটি সামাজিক সমীক্ষা কিছুদিন আগে পরিচালিত হয়েছিল। নিউইয়র্ক শহরে এক নারী প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে খোলামেলা পোশাক পরে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এ সময় তাকে মোট ১০৮ বার মৌখিক হয়রানির শিকার হতে হয় অর্থাৎ বারবার অশোভন মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়। এ সময় লক্ষ করা যায়, অনেক পুরুষই অসৎ উদ্দেশ্যে তার দিকে তাকাচ্ছিল। তবে এখানে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। পরবর্তীতে একই নারী নিজের সাজসজ্জা পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ হিজাব পরিধান করে একই স্থানে দাঁড়িয়ে পরীক্ষাটি পুনরায় পরিচালনা করেন। তখন ফলাফল ভিন্ন ছিল। আগের মতো কেউ তার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়নি, এমনকি কোনো অশোভন মন্তব্যও করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিষয়টি অনুধাবন করুন বা না-ই করুন, লাগামহীন উন্মুক্ততা ও পর্দাহীনতা ধীরে ধীরে পারস্পরিক বিশ্বাসে প্রভাব ফেলতে পারে। এতে ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের মতো অনুভূতি জন্ম নিতে পারে।

স্বভাবগতভাবেই কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর প্রতি অসৎ দৃষ্টিভঙ্গি সহ্য করতে চান না, এতে তার মধ্যে ঈর্ষা ও রক্ষাকর্তার প্রবণতা জাগ্রত হয়। একইভাবে একজন নারীও চান, তার স্বামী যেন কেবল তার প্রতিই আগ্রহী থাকেন এবং অন্য কারও প্রতি দৃষ্টি না দেন। এই পারস্পরিক অনুভূতিই দাম্পত্য সম্পর্কে শান্তি ও সম্প্রীতি গড়ে তোলে, বিশেষত যখন উভয়েই শালীনতা ও পর্দার বিধান মেনে চলেন।

এবার যদি আমরা বিপরীত একটি পরিস্থিতি কল্পনা করি, যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজেদের শালীনতা ও পর্দা সম্পর্কে সচেতন, তাহলে দৃশ্যপট ভিন্ন হয়। সেখানে স্বামীর মনে স্ত্রীর প্রতি অযথা সন্দেহ বা উদ্বেগ থাকে না। অন্য কেউ কী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, সে চিন্তাও তাকে তাড়িত করে না। ফলে তিনি অধিক মানসিক প্রশান্তি ও স্বস্তিবোধ করেন।

একইভাবে যখন একজন পুরুষ তার দৃষ্টি সংযত রাখেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই কেবল তার স্ত্রীর প্রতিই আগ্রহী থাকেন। এর ফলে স্ত্রীর মনেও স্বামীকে নিয়ে কোনো অযথা সন্দেহ বা উদ্বেগ জন্ম নেয় না। তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, তার স্বামী বাইরে গেলেও অন্য কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি দেবেন না বা তুলনা করবেন না। ফলে দাম্পত্য জীবনে অস্বস্তি নয়, বরং মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.al-itisam.com

পর্দার এই অনুশীলন দাম্পত্য সম্পর্কে এক ধরনের নিরাপত্তা ও স্বস্তি এনে দেয়, যা উভয়কেই আরও সুখী করে তোলে।

একজন মুসলিম নারী হিসেবে হিজাব সম্পর্কে আমার অভিমত হলো হিজাব একটি মর্যাদাপূর্ণ বিধান, যা একজন নারীকে সমাজে অবমূল্যায়িত হওয়া থেকে রক্ষা করে। এটি তার সম্মান বৃদ্ধি করে এবং তাকে আরও মূল্যবান করে তোলে। তার সম্মতি ছাড়া কেউ তার ব্যক্তিগত পরিসরে প্রবেশ করতে পারে না, এটি তার আত্মমর্যাদার প্রতীক।

আগে উল্লেখিত সামাজিক পর্যবেক্ষণের কথাটি আবার স্মরণ করা যেতে পারে। যখন ওই নারী খোলামেলা পোশাকে রাস্তায় চলাফেরা করছিলেন, তখন তিনি অসংখ্য কুদৃষ্টি ও অশোভন মন্তব্যের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু হিজাব পরিধান করে বাইরে গেলে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়ে যায়।

এর মাধ্যমে তিনি যেন একটি সুস্পষ্ট বার্তা দেন— তিনি কেবল বাহ্যিক আকর্ষণের বস্তু নন; বরং তার চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বই তাকে প্রকৃত অর্থে মর্যাদাবান করে তোলে। একই সঙ্গে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সীমানা নির্ধারণ করতে পারেন যে, কে তার নিকটবর্তী হতে পারবে আর কে পারবে না।

হিজাব পরিধানের ফলে যারা কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয় বা যাদের দৃষ্টিভঙ্গি অগভীর, তারা স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কারণ তখন আর বাহ্যিক প্রদর্শন নয়, বরং ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধই হয়ে ওঠে মুখ্য।

হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে যারা কেবল বাহ্যিক দিকেই মনোযোগ দেয় এবং যাদের নৈতিক মানদণ্ড নিম্ন, তারা স্বাভাবিকভাবেই এতে আগ্রহী হয় না। কারণ এ পর্যায়ে এসে হিজাব আর তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যম থাকে না।

এই অবস্থায় হিজাবের অর্থ দাঁড়ায় শুধু তাদের সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় রাখা, যারা আপনার প্রকৃত সত্তাকে মূল্য দেয় এবং যারা আপনার চেহারার দিকে নয়; বরং আপনার আত্মিক গুণাবলির দিকে মনোনিবেশ করে এবং যাদের নৈতিক মানদণ্ড উন্নত।

ভুলে যাবেন না! নারী সমাজ হিসেবে আপনি অন্যদের দ্বারা সুন্দর বা অসুন্দর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার ঊর্ধ্বে। তাই অন্যের ইচ্ছা বা প্রত্যাশার ভিত্তিতে জীবনযাপন বা পোশাক নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই। আপনার পোশাক নির্বাচন হওয়া উচিত স্রষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী। এটাই আপনার জন্য কল্যাণকর।

যিনি শূন্য থেকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার পদতলে মাটি সুদৃঢ় করেছেন, তিনি-ই আপনাকে সর্বাধিক ভালোবাসেন। কিছু মানুষ হয়তো আপনার বাহ্যিক সৌন্দর্যের কারণে আপনাকে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু মহান আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা থেকেই। তিনি আপনাকে এমন এক অনন্য সৌন্দর্য দিয়েছেন, যা অন্য কারও সঙ্গে তুলনীয় নয়।

আগে দুই ধরনের হিজাবের কথা বলা হয়েছে তথা নারীর হিজাব এবং পুরুষের হিজাব। পাশাপাশি নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রেও কিছু সীমারেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- বিপরীত লিঙ্গের এমন কারও সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় হাসি-ঠাট্টা বা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা, যিনি আপনার পরিবারের সদস্য নন, তা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

বাস্তবে প্রায়ই দেখা যায়, যখন নারী-পুরুষ উভয়ই এই শরীআতসম্মত বিধানগুলো উপেক্ষা করে, তখন পারস্পরিক আকর্ষণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে চুম্বকের দুই মেরুর মতো। এর ফলেই সামাজিক জীবনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। বৈধ সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ কমে গিয়ে তা অবৈধ সম্পর্কে রূপ নিতে শুরু করে। দাম্পত্য কলহ, নৈতিক অবক্ষয় এবং শেষ পর্যন্ত তা বিভিন্ন অপরাধের দিকে গড়ায়।

এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। যখন উভয় পক্ষই নিজেদের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়, তখন দায়ও উভয়ের ওপর বর্তায়।

সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)-এর একটি গবেষণা অনুযায়ী, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫ লাখ গর্ভপাত সংঘটিত হয়েছে আর এই গর্ভপাতকৃত শিশুদের ৮৬% অবৈধ ছিল। আবার একই সংস্থার অন্য এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২১ সালে সেখানে প্রায় ১৪ লাখ শিশু বিবাহবহির্ভূতভাবে জন্মগ্রহণ করেছে।

এই বাস্তবতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাকেই একা সন্তানের দায়িত্ব বহন করতে হয়। সন্তানের পিতার সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া বছরের পর বছর তিনি সন্তান লালনপালন করেন। এমন পরিস্থিতিতে একজন মায়ের মানসিক অবস্থার কথা ভাবুন এবং সেই সন্তানের জীবনসংগ্রাম কত কঠিন হতে পারে, যে পিতৃহীন পরিবেশে বড় হচ্ছে।

এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি প্রতিরোধে কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে— বিশেষত সূরা নূরের দু'টি আয়াতে, যা পর্দার বিধান আলোচনা করতে গিয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিষয়টি এখন আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, হিজাব বা পর্দার বিধান কেবল একটি ধর্মীয় অনুশাসন নয়; বরং এটি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে শালীনতা, মর্যাদা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস রক্ষার একটি সুষম ব্যবস্থা। এটি মানুষকে আত্মসম্মানবোধে দৃঢ় করে, সম্পর্ককে সুস্থ ও স্থিতিশীল রাখে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই এই বিধানের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা উপলব্ধি করে তা সচেতনভাবে অনুসরণ করাই হতে পারে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের পথ। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

www.al-itisam.com

হেলথ কর্নার

বর্ষায় বাড়ছে শিশুদের ডায়রিয়ার প্রকোপ: প্রয়োজন সচেতনতা

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

বাংলা দিনপঞ্জির দ্বিতীয় ঋতু বর্ষা। আষাঢ় ও শ্রাবণজুড়ে প্রকৃতিতে নেমে আসে বৃষ্টির সজীবতা। কিন্তু এই বর্ষাকাল শুধু প্রশান্তিই বয়ে আনে না, সঙ্গে নিয়ে আসে নানা রোগব্যাধির ঝুঁকিও। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে ডায়রিয়ার প্রকোপ এ সময়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। গৃহবন্দি মানুষ থেকে শুরু করে কর্মজীবী, শিশু কিংবা বৃদ্ধ—সব বয়সী মানুষই বর্ষাকালে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন।

প্রতি বছর বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ার আগে ও পরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। তবে চলতি বছর সময়ের আগেই দেশের নানা অঞ্চলে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুরা। ডায়রিয়ার সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা হলো পর্যাপ্ত স্যালাইন ও তরলজাতীয় খাবার খাওয়ানো। কারণ স্যালাইন ডায়রিয়া বন্ধ না করলেও শরীরের পানি ও লবণের ঘাটতি পূরণ করে পানিশূন্যতা রোধ করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্যালাইন তৈরির সঠিক নিয়ম না জানার কারণে শিশুদের ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। কখনো কখনো এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

গ্রাম কিংবা শহর, ঝুঁকিতে সবাই:

বর্ষাকালে বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপদ পানির সংকট দেখা দেয়। নদী-নালা, খাল-বিল উপচে পড়ে এবং টিউবওয়েলসহ বিশুদ্ধ পানির উৎসগুলো ডুবে যায়। শহরাঞ্চলেও বৃষ্টির পানি ড্রেনের নোংরা পানির সঙ্গে মিশে পরিবেশ দূষিত করে তোলে। রাস্তাঘাট ও বাজারগুলো নোংরা পানিতে সয়লাব হয়ে পড়ে।

বিশেষ করে কাঁচাবাজারের মাছ, মাংস, শাক-সবজি ও ফলমূল দূষিত পানির সংস্পর্শে এসে জীবাণুযুক্ত হয়ে ওঠে। এসব খাবার যথাযথভাবে পরিষ্কার না করে খেলে পেটের নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। মূলত হেপাটাইটিস এ, রোটা ভাইরাস, কলেরা, স্যালমোনেলা ও ই-কোলাই জাতীয় জীবাণু শিশুদের ডায়রিয়ার জন্য দায়ী। আর বর্ষাকাল এসব জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া:

হেপাটাইটিস এ: দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়ায়। এটি যকৃৎ আক্রান্ত করে এবং শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এতে জ্বর, বমি, দুর্বলতা ও পেটব্যথাসহ নানা জটিলতা তৈরি হয়।

রোটা ভাইরাস: রোটা ভাইরাস সাধারণত নবজাতক ও ছোট শিশুদের আক্রান্ত করে। প্রথমে পরিপাকতন্ত্রে সংক্রমণ হয়, পরে তা ডায়রিয়ায় রূপ নেয়।

অ্যাডিনো ভাইরাস: এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শিশুদের জ্বর, সর্দি-কাশির পাশাপাশি পেটের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৬৮* চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

www.al-itisam.com

ব্যাকটেরিয়াজনিত ডায়রিয়া:

স্যালমোনেলা: দূষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে এ ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়। সালাদ, অপর্যাপ্ত রান্না করা খাবার ও দুগ্ধজাতীয় খাবারে এর উপস্থিতি বেশি থাকে। যেসব শিশু মুখে আঙুল দেয়, তাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

ই-কোলাই: এটি অন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে থাকলেও খাদ্য বা পানিদূষণের কারণে অতিরিক্ত সংক্রমণ ঘটিয়ে ডায়রিয়ার কারণ হতে পারে।

শিশুর ডায়রিয়ার লক্ষণ:

শিশুরা সাধারণত ঘন ঘন মলত্যাগ করে থাকে। তাই বারবার পায়খানা করলেই ডায়রিয়া হয়েছে, এমনটি ভাবা ঠিক নয়। তবে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দিলে সতর্ক হতে হবে—

- পানির মতো পাতলা পায়খানা হওয়া।
- মলের দুর্গন্ধ বেড়ে যাওয়া।
- পেটে ব্যথা ও মোচড়ানো।
- মলের সঙ্গে রক্ত আসা।
- বমি হওয়া।
- হজমশক্তি কমে যাওয়া।
- খাবারে অনীহা দেখা দেওয়া।
- প্রস্রাব কমে যাওয়া।
- জ্বর বা কাঁপুনি আসা।
- শিশুর ওজন কমে যাওয়া।
- অতিরিক্ত কান্নাকাটি ও খিটখিটে আচরণ।

শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হলে করণীয়:

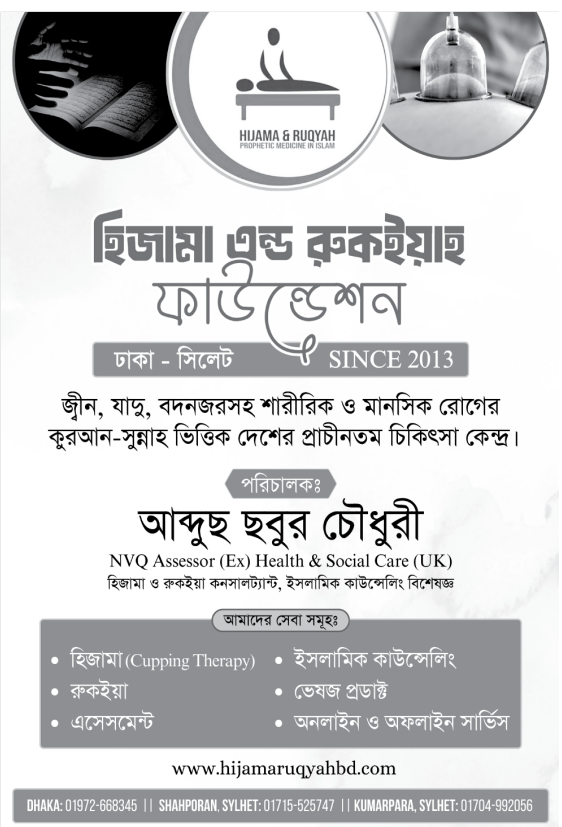
ডায়রিয়ায় আক্রান্ত শিশুর প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে পানিশূন্যতা যেন না হয়, সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।

- ছয় মাসের কম বয়সী শিশুকে ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্যালাইন, ডাবের পানি ও ভাতের মাড় খাওয়ানো যেতে পারে।
- পাকা কলা শিশুর জন্য উপকারী।
- চাল, মুরগি ও কাঁচকলা দিয়ে তৈরি খিচুড়ি খাওয়ানো যেতে পারে।
- গ্যাস বা অ্যালার্জি বাড়ায় এমন খাবার যেমন গরুর দুধ, বিস্কুট ও ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলা উচিত।
- টকদই, পনির ও কলার মতো প্রোবায়োটিক খাবার উপকারী হতে পারে।

সচেতনতাই হতে পারে সুরক্ষা:

বর্ষাকালে শিশুদের সুস্থ রাখতে পরিচ্ছন্নতার বিকল্প নেই। বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই শিশুদের সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত-মুখ ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বাইরের অপরিষ্কার হাতে যেন খাবার না খায়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। খাওয়ার আগে অবশ্যই হাত পরিষ্কার করার অভ্যাস করাতে হবে।

এ ছাড়া নিয়মিত অ্যান্টিসেপটিক সাবান দিয়ে গোসল করালে জীবাণুর সংক্রমণ অনেকাংশে কমে যায়। মনে রাখতে হবে, সামান্য সচেতনতা ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনই শিশুদের ডায়রিয়াসহ নানা রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখতে পারে। তাই এ বিষয়ে পরিবার ও সমাজের সবাইকে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।



www.al-itisam.com

কবিতা

বর্ষাকাল

-আনিছুর রহমান
তেঁতুল-তলা, বগুড়া।

আষাঢ়, শ্রাবণ, বর্ষাকাল
বৃষ্টি পড়ে সকাল-বিকাল।
নাই মেঘ, সাদা মেঘের ভেলা,
হঠাৎ বৃষ্টি ঝরে রাত্রি বেলা।
টানা বৃষ্টিতে রাস্তা-ঘাট ডুবে যায়,
খাল-বিল, নদী ভরে যায়।
কেয়া, কদম নানান ফুল ফোঁটে,
নদীতে নৌকা পালে ছুটে।
নদী পথে হাট-বাজার,
ঘাটে বাঁধা নৌকা সবার।
বর্ষায় মাছ পাই, নদী-সাগরে,
ইলিশের দাম কেন কমে না বাজারে?
সবুজ শ্যামল আমার দেশ,
রূপের রানি বাংলাদেশ।
জন্মে আমি এই দেশে ধন্য,
মাতৃভূমি তোমায় পেয়ে ধন্য।

বৃষ্টির আত্মকথা

-সাব্বির আহমাদ
অধ্যয়নরত, মাদরাসাতুল হাদীস,
নাজির বাজার, বংশাল, ঢাকা।

আমি বৃষ্টি
করি শীতল পরিবেশ সৃষ্টি।
গ্রীষ্মের ভরদুপুরে প্রখর রোদের তাপে
সমস্ত কায়া আর বেশ একাকার হয়ে ভিজে,
তখন আমি আগমন করি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে।
শুকিয়ে যাওয়া পত্র-পল্লবে আমি এনে দেই সজীবতা
মৃত তল্লাটগুলো লাভ করে তাদের প্রাণ ফিরে পাওয়ার আশা।
গৃহের চালে আমি বর্ষিত হয় রিমঝিম রবে
জম্পেশ একটি ঘুমের আয়োজন করি আঁধার রাতে।
বর্ষাকালে পুকুরগুলো ভরে তুলি জলে
গ্রাম-বাংলার মানুষেরা ছুটে ছিপ হাতে পুষ্করিণীর পানে।
আমি আশীর্বাদ ঠিকই তোমাদের তরে
বাইরের কর্মচঞ্চল মানুষদের নিকট অভিসম্পাতও বটে।
বাহিরে গমনে বর্ষাতি নিতে ভুলো না তাই
আর আমার উপর কভু রাগ করো না ভাই।

ফজরের আলো

-মিহাদ হাসান
মেলান্দহ, জামালপুর।

নিশীথ রাতের নীরব শেষেআলো ফোটে ধীরে ধীরে,
ডাকে মুয়াজ্জিন মিনারের চূড়ায়—
এসো ছালাতে, রবের নীড়ে।
ঘুম ভাঙে মুমিন হৃদয়ের,
ওযূর পানিতে পবিত্র প্রাণ,
ফজরের সিজদায় ঝরে পড়ে
বান্দার নীরব আরজ-প্রাণ।
পূর্ব আকাশে লালিমা হাসে,
পাখিরা তোলে সুরের গান,
হে মুমিন, উঠো রবের ডাকে,
ফজরেই মেলে শান্তির প্রাণ।

কবরস্থান

-জুবাইদা আফরোজ
শিক্ষার্থী, ৭ম শ্রেণি, পাঁচটিকরী আলিম মাদরাসা,
ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

ঐ দেখা যায় কবরস্থান,
ঐ তো সবার ঘর,
একদিন তো থাকতেই হবে
মাটি-বিছানা পর।
ধন-সম্পদ, মান-অভিমান
রবে পিছে পড়ে,
সঙ্গে যাবে আমল শুধু
অন্ধকার ওই ঘরে।
ও কবর! তুই চাস না কিছু,
নিস না কোনো ঘুষ,
চিনিস শুধু মুমিন বান্দার
নেক আমলের রূপ।
একজন যদি পাইরে আমি
সৎকর্মে ভরা প্রাণ,
রহমতেরই সুবাসে তার
ভরে ওঠে কবরস্থান।
নেক আমলে যার জীবন গড়া,
ঈমান যার সাথি,
আল্লাহর দয়া পেয়ে সে তো
পাবে জান্নাত-পথই।

www.al-itisam.com

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

সীমান্তে বিএসএফের উসকানি ও বিজিবির শক্ত অবস্থান

তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে দেশের সীমান্ত সুরক্ষায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) অভূতপূর্ব শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়ার সংবাদে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) উপর্যুপরি উসকানির বিপরীতে বিজিবির এই কঠোর মনোভাবের বিষয়টি ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে জানানো হয়, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তে বিএসএফ বিনা উসকানিতে ফাঁকা গুলি, বাংলাদেশি নাগরিকদের আটক ও সীমানা লঙ্ঘনের চেষ্টা চালায়। বিগত সরকারগুলোর তুলনায় বর্তমান সরকারের স্পষ্ট নির্দেশনায় বিজিবি এবার নমনীয় নীতি পরিহার করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিও ও সূত্রে দেখা যায়, বিএসএফের প্রতিটি অন্যায্য পদক্ষেপের জবাবে বিজিবি তাৎক্ষণিক পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে এবং ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে কড়া প্রতিবাদ জানাচ্ছে। জনসাধারণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিজিবির এই আপসহীন ভূমিকা ও সাহসিকতাকে সাধুবাদ জানাচ্ছে। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সীমান্ত সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতির কারণেই বিজিবি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এমন দৃঢ় ও কার্যকর অবস্থান নিতে সক্ষম হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

সমাজতন্ত্র ও ইসলামের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে জায়নবাদের জন্ম

উনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের রক্ষাকবচ হিসেবে জন্ম নেওয়া জায়নবাদকে কেবল সমাজতন্ত্র নয়, পরবর্তীতে ইসলামের বিরুদ্ধেও অত্যন্ত কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বিশ্লেষকদের মতে, পূর্ব ইউরোপের ইয়াহূদী যুবসমাজকে শ্রেণি সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে দূরে সরাতে জায়নবাদের উৎপত্তি হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এই জাতীয়তাবাদী ধারণাকে অর্থ ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রস্থলে, বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উছমানীয় খেলাফতের পতনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট করতে জায়নবাদকে ব্যবহার করা হয়। ১৯১৭ সালের বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তীনি ভূখণ্ডে ইয়াহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করা হয়, যা ছিল সরাসরি ইসলামী ঐতিহ্য ও ভূ-রাজনীতির ওপর আঘাত। পরবর্তীকালে, শীতল যুদ্ধ এবং তার অবসানের পর জায়নবাদকে পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থে 'ইসলামভীতি' (Islamophobia) ছড়ানোর প্রধান হাতিয়ারে রূপান্তর করা হয়। ফিলিস্তীনিদের ওপর নিপীড়নকে আড়াল করতে মুসলিমদের 'উগ্রপন্থি' হিসেবে চিত্রায়িত করা এবং পবিত্র আল-আক্বছা মসজিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় অনুভূতি ও প্রতিরোধকে দুর্বল করার একটি দীর্ঘমেয়াদি নীল নকশা। এভাবে সমাজতন্ত্রের পর ইসলামী জাগরণকে রুখে দিতে জায়নবাদ পুঁজিবাদের প্রধান বিশ্বস্ত পাহারাদার হিসেবে কাজ করছে।

পশ্চিমবঙ্গের মাদরাসায় ‘বন্দে মাতরম’ বাধ্যতামূলক

পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলোর পর এবার সব স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদরাসায় সকালের সমাবেশে ‘বন্দে মাতরম’ গানটি গাওয়া বাধ্যতামূলক করেছে নবগঠিত শুভেন্দু অধিকারীর সরকার গত ১৯শে মে, ২০২৬ খ্রি.। রাজ্য সরকারের এই নির্দেশনার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-সহ বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে। তাদের মতে, ‘বন্দে মাতরম’ গানের কিছু চরণ ইসলামের একেশ্বরবাদের পরিপন্থি এবং এটি জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন। মুসলিম সংগঠনগুলো এই সরকারি নির্দেশিকাকে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি আখ্যা দিয়ে এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়েরসহ আইনি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কামাল মাওলা মসজিদকে মন্দির ঘোষণা

ভারতের মধ্যপ্রদেশের ঐতিহাসিক ভোজশালা-কামাল মাওলা মসজিদ কমপ্লেক্সকে হিন্দু মন্দির হিসেবে ঘোষণা করেছে সে দেশের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগের (ASI) বৈজ্ঞানিক জরিপ প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে আদালত এই রায় প্রদান করে। রায়ে স্থাপনাটিকে দেবী বাগদেবীর (সরস্বতী) মন্দির হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই রায়কে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম পক্ষ আদালতের এই সিদ্ধান্তকে পক্ষপাতদুষ্ট আখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো আনন্দ মিছিল করেছে। মুসলিম সম্প্রদায়কে হয়রানি, হুমকি ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা যেসব কৌশল গ্রহণ করেছেন, এটি তার একটি। মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য ভারতে চলমান এসব অভিযান বেশ ভয়াবহ।

মুসলিম বিশ্ব

গাযা গণহত্যায় ইসরাঈলকে অস্ত্র জুগিয়েছে ভারতসহ ৫১ দেশ

ফিলিস্তীনের গাযায় চলমান গণহত্যায় ইসরাঈলকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অস্ত্র জুগিয়েছে ভারতসহ বিশ্বের ৫১টি দেশ। জাতিসংঘের একটি স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, আন্তর্জাতিক আইন ও ১৯৪৮ সালের জেনোসাইড কনভেনশন লঙ্ঘন করে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও যুক্তরাজ্যের পাশাপাশি এশিয়ার দেশ হিসেবে ভারত ইসরাঈলে ড্রোন, বিস্ফোরক ও সামরিক যন্ত্রাংশ সরবরাহ করেছে। বিশেষ করে ভারতের তৈরি ‘হার্মিস-৯০০’ ড্রোন গাযা অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই অস্ত্র সরবরাহকে যুদ্ধাপরাধের শামিল বলে আখ্যা দিয়েছে এবং অবিলম্বে বৈশ্বিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার দাবি জানিয়েছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

বিশ্বের প্রথম কোয়ান্টাম ব্যাটারির সফল নমুনা তৈরি

মহাবিশ্বের অন্যতম জটিল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের প্রথম কোয়ান্টাম ব্যাটারির সফল নমুনা (প্রোটোটাইপ) তৈরি করেছেন বিজ্ঞানীরা। প্রচলিত রাসায়নিক ব্যাটারির বিকল্প হিসেবে এটি জ্বালানি জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ‘সুপারঅ্যাবজরপশন’ নীতি কাজে লাগিয়ে এই ব্যাটারি তৈরি করা হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যাটারির আকার যত বাড়বে, এটি তত দ্রুত চার্জ হবে। সাধারণ ব্যাটারির মতো এটি দীর্ঘ সময় পর কার্যক্ষমতা হারাবে না এবং এতে কোনো পরিবেশ দূষণকারী উপাদান নেই। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ থেকে শুরু করে বৈদ্যুতিক গাড়িতে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রক্রিয়া চলছে। তাৎক্ষণিক চার্জিং সুবিধার এই কোয়ান্টাম ব্যাটারি আগামী দিনে বৈশ্বিক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের টেকসই সমাধান দেবে বলে আশা করছেন গবেষকরা।

বিদ্যুৎ ছাড়াই ঘর ঠান্ডা রাখার পরিবেশবান্ধব কৌশল উদ্ভাবন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যখন বিশ্বজুড়ে তাপপ্রবাহের প্রকোপ বাড়ছে, ঠিক তখনই শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের (এসি) বিকল্প হিসেবে নতুন ধরনের কুলিং সিস্টেম উদ্ভাবন করেছেন সঊদী আরবের কিং আব্দুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড কনোলজির বিজ্ঞানীরা। তীব্র দাবদাহের মধ্যে বিদ্যুৎ ছাড়াই ঘর ঠান্ডা রাখার এক অভিনব ও সাশ্রয়ী কৌশল উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা ফ্যানের বিকল্প হিসেবে এই প্রযুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় বড় ভূমিকা রাখবে। গবেষকরা এমন একটি বিশেষ তরল বা কোটিং (প্রলেপ) তৈরি করেছেন, যা ঘরের ছাদ ও দেওয়ালে ব্যবহার করা যাবে। এই প্রযুক্তি সূর্যের আলো ও তাপকে শোষণ না করে সরাসরি মহাশূন্যে প্রতিফলিত করে দেয়। একে বিজ্ঞানের ভাষায় ‘প্যাসিভ রেডিয়েটিভ কুলিং’ বলা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, তীব্র গরমেও এই প্রলেপ ব্যবহারের ফলে ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা বাইরের চেয়ে প্রায় ৫ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যায়। পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী এই প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের এসি ব্যবহারের খরচ বাঁচাবে এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

সওয়াল-জওয়াব

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): হানাফী, মালেকী, শাফেঈ, হাম্বলী, সালাফী বা আহলেহাদীছের মাঝে যে বিভিন্ন দল রয়েছে এগুলো কি ফিরকার অন্তর্ভুক্ত? নাকি দেওবন্দী, মাইজভান্ডারী, সুফী, সুন্নী এগুলো ফিরকা? দলীলসহ জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর: ইসলামে সব মতভেদ বা মাযহাবকে ‘ভ্রষ্ট ফিরকা’ বলা সঠিক নয়। হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী—এগুলো ফিক্বহী মাযহাব; আক্বীদাগত ভিন্ন দল নয়। চার ইমামই আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইজতিহাদী মতভেদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘মুজতাহিদ সঠিক হলে দুই ছওয়াব, ভুল হলে এক ছওয়াব পাবে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৫২)*। ‘সালাফী’ বা ‘আহলেহাদীছ’ বলতে তাদের বুঝায় যারা মানুষের মতামত উপেক্ষা করে কুরআন, সুন্নাহ ও ছাহাবীদের মানহাজ অনুসরণ করে। তারা হবে নাজাতপ্রাপ্ত দল *(মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩/৩৪৭)*। আর দেওবন্দী, সুফী, মাইজভান্ডারী ও বেরেলভী—সবার আক্বীদা এক নয়। এদের মধ্যে কিছু ছহীহ ও কিছু ভ্রান্ত আক্বীদা-আমল আছে। বিশেষত মাইজভান্ডারী ও বেরেলভীদের মাঝে ভ্রান্ত কবরপূজা, মৃতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা, অতিরঞ্জিত পীরপূজা, গান-বাজনা ও ধ্যানের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চর্চা পরিলক্ষিত হয়, যা তাদের স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার উপর প্রমাণ করে। সুফীদের হুলূল, ওয়াহদাতুল উজূদ, ফানা ও বাক্বার মতো বিভ্রান্তিকর আক্বীদা রয়েছে, যা ইসলাম বিরোধী ও ভ্রষ্ট আক্বীদা।

প্রশ্ন (২): পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করো। এমন কথা বলা বা বিশ্বাস করা যাবে কি?

-আবুল ফতেহ
ফরিদপুর।

উত্তর: উক্ত কথা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। পাপ ও পাপী উভয়কেই ঘৃণা করতে হবে। কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে পাপ ও পাপীদের অপছন্দ তথা ঘৃণা করার কথা বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূরা বাকারার ২/১৯০ ও ২/২০৫ আয়াত। অনুরূপভাবে একাধিক আয়াতে তিনি বিভিন্ন পাপের শাস্তি বর্ণনা করেছেন। পাপীকে শাস্তি প্রদান করা তার প্রতি ঘৃণাকে আবশ্যক করে। রাসূল ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে কিছু দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে কিছু দেওয়া থেকে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি অবশ্যই তার ঈমানকে পূর্ণ করেছে’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪৬৮১)*। উক্ত হাদীছ থেকে পাপীকে ঘৃণা করার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে আসে।

প্রশ্ন (৩): কেউ যদি বলে যে, এই ঔষধ খেয়ে আমার জ্বর ভালো হয়ে গেছে, তাহলে কি শিরক হবে? আমরা তো অনেক সময় এমন বলি।

-হাসিবুল ইসলাম
সাতক্ষীরা।

উত্তর: ‘আল্লাহ তাআলার রহমতে বা দয়ার ভালো হয়েছে’ এভাবে বলবে। তবে রোগমুক্তির মাধ্যম হিসেবে ঔষধ গ্রহণ করা যায়। উসামা ইবনু শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু বেদুঈন এসে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব? তিনি বললেন, ‘তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তাআলা এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার জন্য তিনি চিকিৎসাও সৃষ্টি করেননি; তবে একটি রোগ ছাড়া’। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সেটা কী? তিনি বললেন, ‘বার্ধক্য’ *(আবূ দাঊদ, হা/৩৮৫৫; তিরমিযী, হা/২০৩৮)*। ঔষধ নিজে নিজেই সুস্থতা দান করেছে এমন বিশ্বাসে যদি কেউ প্রশ্নে উল্লেখিত কথা বলে তাহলে শিরক হবে।

প্রশ্ন (৪): জিনকে কি বশ করা বা বোতলের মধ্যে আটকে রাখা যায়? তারা হারানো বা চুরি করা জিনিসের খবর দেয় কীভাবে?

-ইয়াসির রাব্বি
নাটোর।

www.al-itisam.com

উত্তর: কোনো জিনকে এমনভাবে বশ করা যায় না যে, তার ইচ্ছাশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে কোনো তান্ত্রিক বা জাদুকরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজ স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে কখনো কখনো সে অন্যায় চাহিদা পূরণ করে থাকে। আবার কখনো তার কাছ থেকে জাদু ইত্যাদির মাধ্যমে জোরপূর্বক কাজ করিয়ে নেওয়া হয় *(আল-আনআম, ৬/১২৮; তাফসীরে কুরতুবী, ৭/৮৪; মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ১১/৩৩০ ও ১৩/৮০-৮৫)*। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কেউই গায়েব জানে না *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*। সুতরাং কোনো জিনের পক্ষে কোনো মাধ্যম ছাড়া হারানো বা চুরি হওয়া বস্তু সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাদের দেওয়া বেশিরভাগ সংবাদ সঠিক হয় না। যেগুলো সঠিক হয় সেগুলো তারা বিভিন্ন মাধ্যমে জেনে থাকে। যেমন-

১. জিনদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। যেই জিনের সামনে চুরি বা হারানোর ঘটনা ঘটেছে তার মাধ্যমে অবগত হয়।

২. তারা দ্রুত পরিভ্রমণের ক্ষমতা কাজে লাগায়। জিনেরা দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। ফলে হারানো বস্তুর সন্ধান পাওয়া তাদের জন্য সহজ হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, জিনকে বশ করা হারাম। কারণ জাদু বা শিরক করা ছাড়া জিনকে বশ করা যায় না। অনুরূপভাবে কোনো গণক বা কবিরাজের কাছে গিয়ে হারানো বস্তুর সন্ধান চাওয়া হারাম *(মুসনাদে আহমাদ, হা/৯৫৩৬)*।

প্রশ্ন (৫): গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসা শাসকের আনুগত্য করা কি ফরয? এমন কোনো নজির আমাদের সালাফদের মাঝে আছে কি?

-মারুফ ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। গণতন্ত্রে জনগণকে ক্ষমতার উৎস মনে করা হয়, যা কুফরী। গণতন্ত্র একজন খ্রিষ্টান কর্তৃক উদ্ভাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, যার প্রায় প্রতিটি ধারায় ইসলামবিরোধী নিয়মনীতি রয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসক নির্বাচন শরীআতসম্মত নয়। তবুও যদি কেউ যেকোনো মাধ্যমে শাসক নির্বাচিত হয়ে যায় তাহলে শরীআতের নিয়ম হলো, তার আনুগত্য করতে হবে এবং তার বিরোধিতা করা যাবে না *(ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৭)*। সালাফদের সময়ে গণতন্ত্র বা গণতন্ত্রের সদৃশ কোনো তন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না।

প্রশ্ন (৬): আমাদের মসজিদের ইমাম বিশ্বাস করে যে, মালাকুল মাউতের কাছে লিস্ট আছে যে কখন কার জান কবয করতে হবে? এ বিশ্বাস রাখা যাবে কি এবং তার পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মো. আবূ সাঈদ
খোলাহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর: 'মালাকুল মাউতের কাছে আল্লাহ প্রদত্ত একটি তালিকা আছে'- এটি কুরআন-হাদীছের ভাষা নয়; বরং মৃত্যুর সময় পূর্বনির্ধারিত এবং মালাকুল মাউত সেই নির্ধারণ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে' *(আস-সাজদাহ, ৩২/১১)*। তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি সবকিছু নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি' *(আল-কামার, ৫৪/৪৯)* এবং তিনি আরও বলেন, 'যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্ত পিছাতেও পারবে না, আগাতেও পারবে না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৩৪)*। মানুষের আয়ু ও মৃত্যুর সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও লিখিত *(ছহীহ বুখারী, হা/৩২০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৩)*। সুতরাং 'লিস্ট' শব্দটি মূল নছের ভাষা নয়। তাই শব্দটি ব্যবহার করলে এ আক্বীদা রাখতে হবে যে, সবকিছু আল্লাহর নির্ধারণে, মালাকুল মাউত কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা, তিনি স্বতন্ত্রভাবে গায়েব জানেন না এবং এই আক্বীদা পোষণকারী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন (৭): অসুস্থতা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত নাকি শাস্তি অথবা পরীক্ষা? হাদীছের আলোকে জানাবেন।

মো. সাজিদুল ইসলাম
খুলনা।

উত্তর: অসুস্থতাসহ যেকোনো মুছীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা নাকি শাস্তি- তা নির্ভর করে ব্যক্তির অবস্থার উপর। ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তাহলে মুছীবত তার জন্য শাস্তি নয়; বরং ছবর ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টির বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। আর যদি ব্যক্তি ঈমানদার হয় এবং সে কোনো গুনাহ করে ফেলে, তখন তার গুনাহ মোচন করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাকে মুছীবতে ফেলেন। এটা তার জন্য শাস্তি নয়, বরং কল্যাণ কামনা। রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে মুছীবতে ফেলেন' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪৫)*। অপর হাদীছে রাসূল ﷺ বলেন, مَا يُصِيبُ

www.al-itisam.com

الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاه ‘মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আসে, এমনকি কাঁটা যা তার দেহে প্রবেশ করে, এসবের বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৪২)*। আর যদি ব্যক্তি কাফের বা ফাসেক হয়, তাহলে তার জন্য মুছীবত আসে শাস্তি বা কর্মফল হিসেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন’ *(আশ-শূরা, ৪২/৩০)*।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (৮): মানুষের বীর্য পাক নাকি নাপাক? এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী সঠিক বিষয়টি জানতে চাই।

-সোহানুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর: মানুষের বীর্য পবিত্র। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হুমাম বিন হারেছ একদিন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর মেহমান হন। এমতাবস্থায় সকালে তিনি কাপড় ধুতে থাকলে আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-এর দাসী সেটা দেখেন এবং তাকে সেটা অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বললেন, তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, সে বীর্য দেখলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে ফেলবে। আর না দেখা গেলে স্থানটিতে কেবল পানি ছিটিয়ে দিবে। কেননা আমি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য ঘষা দিয়ে তুলে ফেলেছি এবং তিনি সেই কাপড়েই ছালাত আদায় করেছেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৮; আবূ দাঊদ, হা/৩৭১)*।

প্রশ্ন (৯): টয়লেটের ভেতর ওযূ করার সময় শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং ওযূ শেষে দু‘আ পাঠ করা যাবে কি? আর টয়লেটে প্রবেশের দু‘আ ভুলে গেলে তা কি টয়লেটের ভেতরে গিয়ে পড়া যাবে?

-বুলবুল
পঞ্চগড়।

উত্তর: টয়লেটের ভেতরে ওযূ করার সময় শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং ওযূ শেষে হাদীছে বর্ণিত দু‘আ পাঠ করা যাবে। টয়লেটে বসার সময় দু‘আ পড়ে বসবে আর উঠে বের হওয়ার দু‘আ পড়বে। বসার পরে মনে পড়লে মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে বলবে। উল্লেখ্য যে, বাথরুম অব্যশই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে।

ছালাত

প্রশ্ন (১০): ছালাত যদি তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট হয় এবং মাসবূক এসে যদি দেখে যে, ইমাম রুকূতে আছেন, তাহলে সে প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) বলে রাফউল ইয়াদাইন করবে। অতঃপর হাত বেঁধে পুনরায় ‘আল্লাহু আকবার’ বলে রুকূতে চলে যাবে কি? নাকি সরাসরি রুকূতে যাবে? মাসবূকের কি রুকূতে যেতে রাফউল ইয়াদাইন করতে হবে?

-মো. হাবিবুল্লাহ
ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর: মাসবূক ব্যক্তি যদি এসে ইমামকে রুকূতে পায়, তাহলে তাকবীরে তাহরীমা তথা আল্লাহু আকবার বলে রাফউল ইয়াদাইন করে সরাসরি ইমামের অবস্থান গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়বার তাকবীর বা রাফউল ইয়াদাইন করা লাগবে না। মুআয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করতে এসে ইমামকে কোনো এক অবস্থায় পেল, তখন ইমাম যেরূপ করে সেও যেন অনুরূপ করে’ *(তিরমিযী, হা/৫৯১)*।

প্রশ্ন (১১): একই ইমাম একই ব্যক্তির জানাযার ছালাতে দুইবার ইমামতি করতে পারবেন কি?

-তানজিল চৌধুরী

উত্তর: একজন ইমাম একজন মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাতে একাধিকবার ইমামতি করতে পারবেন না *(আল মুগনী, ২/৩৮২)*।

প্রশ্ন (১২): মসজিদে যদি ফজরের ছালাত দেরি করে পড়া হয় অর্থাৎ আকাশ ফর্সা হয়ে গেলে পড়া হয় (তারা একটি হাদীছও দলীল দেয়), তাহলে সেই মসজিদে ছালাত পড়া যাবে কি?

-শাহনাজ পারভিন।

উত্তর: মসজিদে জামাআতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করতে হবে। সময়মতো ছালাত আদায় না হলে কর্তৃপক্ষকে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাতের জন্য বলতে হবে। তারপরও তারা সময় পরিবর্তন না করলে সময়মতো বাড়িতে ছালাত আদায় করে নিতে হবে। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, ‘সে সময় তুমি কী করবে, যখন তোমাদের উপর শাসকবৃন্দ এমন হবে, যারা ছালাতের প্রতি অমনোযোগী হবে অথবা তা সঠিক সময় হতে পিছিয়ে দিবে?’ আমি বললাম, আপনি আমাকে কী নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, ‘এ সময়ে তুমি তোমার ছালাতকে সঠিক সময়ে আদায় করে নিবে। অতঃপর তাদের সাথে যা পাও, তা

www.al-itisam.com

আবার আদায় করবে। এ ছালাত তোমার জন্য নফল হিসাবে গণ্য হবে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৮; আবূ দাঊদ, হা/৪৩১)*। আর তারা যে হাদীছ দলীল হিসেবে দেয় তার অর্থ হলো ফজরের ছালাত অন্ধকারে শুরু হবে আর উজ্জ্বল হলে শেষ হবে *(শরহু মাআনিল আছার, ১/১৮৪)*।

প্রশ্ন (১৩): বিয়ে না করলে জামাআতে ইমামতি করতে পারবে না, যোগ্য কেউ থাকলে তার থেকে অযোগ্য কেউ ছালাত পড়াতে পারবে না, সুস্থ মানুষ থাকলে অসুস্থ তথা অন্ধ, খোঁড়া কেউ ইমামতি করতে পারবে না। এ কথাগুলো কি সঠিক?

-মোস্তফা
রংপুর।

উত্তর: ক. ইমামতির জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৩০২)*। খ. মসজিদের নির্ধারিত ইমাম না থাকলে উপস্থিত মুছল্লীদের মধ্যে যার বিশুদ্ধ তিলাওয়াতসহ অধিক পরিমাণ কুরআন মুখস্থ থাকবে সে অধিক যোগ্য বিবেচিত হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩)*। আর যদি ইমাম নির্ধারিত থাকে, তাহলে তিনিই অধিক যোগ্য বিবেচিত হবেন। গ. অন্ধ ব্যক্তি ইমামতি করতে পারবে *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৭)*। ঘ. ছালাতে দাঁড়াতে সক্ষম এমন খোঁড়া ব্যক্তি ইমামতি করতে পারবে *(আল-মুগনী, ২/১৪৪)*।

প্রশ্ন (১৪): বেশ কিছু লোকের জুমআ কারণবশত ছুটে যায়, তাদের মাঝে আলেমও আছে। তারা কি জুমআ পড়া হয়েছে এমন মসজিদে খুৎবা দিয়ে দ্বিতীয়বার জুমআ পড়তে পারবে?

-তোজাম্মেল
গাজীপুর।

উত্তর: একই মসজিদে একাধিকবার খুৎবা দিয়ে একাধিকবার জুমআর জামাআত করা জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলার রাসূল ﷺ ও ছাহাবীগণ থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই। বরং জুমআর জামাআত না পেলে পরে যোহরের ছালাত জামাআতে আদায় করবে। অতএব, একই মসজিদে একাধিকবার জুমআ আদায় করা জায়েয নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ, ৮/২৬২)*।

প্রশ্ন (১৫): আমি প্রায়ই ব্যবসায়িক কাজে জয়পুরহাট যাই। এতে আমার যোহর ও আছর একত্রে পড়া হয়। এমতাবস্থায় আমি কি ২+২ করে পড়ব, নাকি ৪+৪ করে? একসাথে পড়ব নাকি আলাদা? বিষয়টি বুঝিয়ে বলে বাধিত করবেন।

-রিফাত বিন শামছুর
আড়িয়া বাজার, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তর: মুসাফির ব্যক্তির কছর করাই সুন্নাত। মুসাফির চার রাকআত বিশিষ্ট ছালাত কছর করবে, যখন সে এমন দূরত্ব অতিক্রম করে যাকে তার এলাকার মানুষের প্রচলিত রীতিতে 'সফর' বলা হয়। কেননা শরীআতে কছর করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দূরত্ব নির্ধারণকারী স্পষ্ট দলীল নেই *(আল-ফাতওয়া আল-কুবরা ইবনে তাইমিয়্যাহ, ৫/৫২৫)*। সুতরাং উক্ত সফরে যোহর ও আছর ছালাতকে ২+২ রাকআত করে একসাথে পড়া যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন ইকামত হতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর অবস্থায় চলার পথে থাকতেন, তখন তিনি যোহর ও আছরের ছালাত একত্রে আদায় করতেন এবং মাগরিব ও এশার ছালাতও একত্রে আদায় করতেন *(ছহীহ বুখারী, হা/১১০৭)*।

প্রশ্ন (১৬): ছালাতের মধ্যে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে কি?

-হাবিবুল্লাহ
গাজীপুর।

উত্তর: ছালাতরত অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার থেকে সম্ভবপর বিরত থাকার চেষ্টা করবে। অতীব প্রয়োজন হলে তা ব্যবহার করা যাবে *(আবূ দাঊদ, হা/৯২২)*।

প্রশ্ন (১৭): কেউ নিজে থেকে তেমন ছালাত আদায় করে না। শিক্ষক বা কারো ভয়ে ছালাত আদায় করে, তাহলে তার ছালাত কবুল হবে কি? যদি শিক্ষকের ভয়ে ওযূ না করেই ছালাতে দাঁড়ায়, তাহলে শিক্ষক দায়ী হবে কি?

-তুহিন ইসলাম
ইসলামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: ছালাতসহ প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যত শর্ত *(আল-আনআম, ৬/১৬২; ছহীহ বুখারী, হা/০১)*। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যত ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না *(আল-মাঊন, ১০৭/৪-৬)* এবং ঐ ব্যক্তি গুনাহগার হবে। ওযূ ছাড়া ছালাত শুদ্ধ হয় না *(আল-মায়েদা, ৫/৬)*। শিক্ষকের চেয়ে বেশি ভয় করতে হবে আল্লাহ তাআলাকে। শিক্ষক যেহেতু জেনেশুনে ওযূ ছাড়া ছালাত আদায়ে বাধ্য করেনি, তাই তিনি দায়ী হবেন না; বরং অবহেলা ও নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে ছাত্রই দায়ী হবে। এমনকি সে যদি ওযূ ছাড়া ছালাত আদায়কে বৈধ মনে করে, তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ ছালাতের জন্য ওযূর আবশ্যকতা কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত *(আল-মায়েদা, ৫/৬)*।

www.al-itisam.com

যাকাত

প্রশ্ন (১৮): কেউ মারা গেলে মৃতের পরিবারকে হাদিয়াস্বরূপ টাকা প্রদান করলে তা কি যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-কামরুন নাহার।

উত্তর: না, হাদিয়া ও যাকাত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। হাদিয়া ধনী-গরীব সকলকেই দেওয়া যায় আর যাকাত গ্রহণ করতে হলে হক্বদার হতে হয়। তাই ব্যক্তি যদি অসচ্ছল তথা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তাহলে তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে *(আত-তাওবা, ৯/৬০)*। তবে তা মৃত্যুর সময় না দিয়ে পরবর্তীতে দিবে।

প্রশ্ন (১৯): একজনের বাড়িতে আগুন লেগে সব পুড়ে যায়, তাই আমি সাহায্য করার নিয়্যতে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম। বর্তমানে তাদের অবস্থা সচ্ছল। এখন যদি না দেই, তবে কি আমি গুনাহগার হব?

-এস. এম. শাহ আলম
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী আপনি যদি এখন তাদেরকে টাকা না দেন, তাহলে আপনি গুনাহগার হবেন না (ইন-শা-আল্লাহ)। তবে ভালো কাজের নিয়্যত করার কারণে আপনি এক নেকী অর্জন করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৫০১)*। তারা যেহেতু বর্তমানে সচ্ছল, তাই আপনি অন্য দরিদ্র মানুষদের সাহায্য করতে পারেন।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২০): আমি সরকারি চাকরি করি। মেধায় চাকরি নিয়েছি কোনো রকম ঘুষ ছাড়া। কিন্তু আমার পোস্টিং হয়েছে বাড়ি থেকে ৫০০ কি.মি. দূরে। এখন বদলি নিতে চাচ্ছি, কিন্তু টাকা ছাড়া বদলি হচ্ছে না। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়ে টাকা দিয়ে বদলি নেওয়া জায়েয হবে কি?

-মোকছেদুল
পিরোজপুর।

উত্তর: ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই হারাম। রাসূল ﷺ ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতা উভয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন *(আবূ দাউদ, হা/৩৫৮০)*। বদলির জন্য অর্থ দেওয়া মানে অবৈধভাবে কোনো বিশেষ সুবিধা নেওয়া, যা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। ঘুষ দিয়ে সুবিধাজনক স্থানে বদলি নেওয়ার কারণে অন্য কোনো যোগ্য সহকর্মীর প্রাপ্য অধিকার নষ্ট হতে পারে, যা সরাসরি যুলমের শামিল। এছাড়া বাংলাদেশের আইন অনুযায়ীও ঘুষ আদান-প্রদান দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রশ্ন (২১): আমাদের বাজারে সব নাপিত হিন্দু। এখন তাদের কাছে মাথার চুল কাটা যাবে কি বা তাদের সাথে কোনো লেনদেন করা যাবে কি?

-মাহিম।

উত্তর: অমুসলিম বা হিন্দু নাপিতের কাছে চুল কাটা এবং তাদের সাথে ব্যবসায়িক বা বৈষয়িক লেনদেন করা জায়েয। নবী ﷺ ও ছাহাবীগণ মদীনার ইয়াহূদীদের সঙ্গে আদান-প্রদান ও লেনদেন করেছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, নবী ﷺ জনৈক ইয়াহূদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যশস্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৫০৯)*। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের জমি এ শর্তে ইয়াহূদীদের দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের শ্রমে তাতে চাষাবাদ করবে, তার বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের হবে *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৯৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৫১)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায়, বৈষয়িক হালাল বিষয়ে অমুসলিমদের সাথে লেনদেন করা যায়।

প্রশ্ন (২২): স্বামী মৃত্যুবরণ করলে আগে থেকে পরিধান করা নাকফুল, কানের দুল, হাতের চুড়ি, মালা ইত্যাদি খুলে ফেলা কি জায়েয না নাজায়েয?

-রবিউল ইসলাম
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর: স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীর আগে থেকে পরিধানকৃত নাকফুল, কানের দুল, হাতের চুরি, মালা, পরিহিত শাড়ি খুলে রাখার রেওয়াজ হিন্দুদের পক্ষ থেকে চলে আসা বাড়াবাড়ি ও কুসংস্কার। অন্যদিকে সদ্য বিধবা স্ত্রীকে নতুন শাড়ি উপহার দেওয়াও কুসংস্কার মাত্র। ইদ্দত কালে তথা চার মাস দশ দিন স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করবে এবং শাড়ি বা অলংকার পরিধান করে সাজসজ্জা গ্রহণ করতে পারবে না। একান্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হবে না *(আবূ দাউদ, হা/২৩০০, ২৩০৪; তিরমিযী, হা/১২০৪)*।

প্রশ্ন (২৩): দীর্ঘদিন যাবৎ গোপনাঙ্গে সমস্যা সহ্য করতে না পেরে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে গোপনাঙ্গ দেখানো যাবে কি? কোনো মেয়ের গোপনাঙ্গে সমস্যা হলে এবং মহিলা ডাক্তার না পাওয়া গেলে করণীয় কী?

-সারওয়ার জাহান
গোদাগাড়ি, রাজশাহী।

উত্তর: এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে, যেমন- মৃগী রোগে আক্রান্ত এক কালো বর্ণের মহিলাকে রাসূল ﷺ ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছিলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৬৫২)*।

www.al-itisam.com

কিন্তু যদি চিকিৎসা প্রয়োজন হয় ও নিরুপায় অবস্থা হয়, তাহলে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে গোপনাঙ্গ দেখাতে কোনো অসুবিধা নেই। নবী ﷺ একবার আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে একজন মুশরিক নারীর কাছে প্রেরণ করলেন, যেই নারীর কাছে একটি চিঠি ছিল। সেই নারী সেই চিঠিটির কথা অস্বীকার করলে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে উলঙ্গ করে তল্লাশি করার হুমকি দেন। এরপরে বাধ্য হয়ে সেই নারী চিঠিটি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দিয়ে দেয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৮৩)*। কোনো নারীর গোপনাঙ্গে সমস্যা হলে প্রথমে মহিলা ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। না পাওয়া গেলে বিশ্বস্ত পুরুষ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা নেওয়া যায়।

প্রশ্ন (২৪): আমার দাড়ি বড় হওয়াতে গিট্টু দিয়ে রাখি, এটা কি শরীআতসম্মত?

-আব্দুল জাব্বার মন্ডল
কুমিল্লা।

উত্তর: দাড়িতে গিট্টু দেওয়া বা বেণি করা নিষেধ। রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا ، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بريء. ‘যে ব্যক্তি তার দাড়িতে গিট্টু দেয় অথবা ঘোড়ার গলায় ধনুকের তার বাঁধে অথবা প্রাণীর বিষ্ঠা দ্বারা ইস্তিনজা করে, তার থেকে মুহাম্মাদ ﷺ দায়মুক্ত’ *(আবূ দাঊদ, হা/৩৬)*।

প্রশ্ন (২৫): বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী গান বা নাশীদের ব্যবস্থা থাকে। রাসূল ﷺ-এর যুগে কি এগুলো ছিল? শরীআহ অনুযায়ী এগুলো করার বিধান কী?

-রাফিউল ইসলাম
পাবনা।

উত্তর: রাসূল ﷺ-এর ছাহাবীগণ কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিভিন্ন মাজলিস শুরু করতেন। আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম যখন কোনো আলোচনা তথা ফিক্বহী আলোচনার মজলিসে বসতেন, তখন তাদের মধ্যে একজন কোনো সূরা পাঠ করতেন অথবা একজনকে কুরআনের কোনো একটি সূরা পাঠ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হতো *(মুসতাদরাক হাকেম, হা/৩২২; বায়হাক্বী, আল-মাদখাল, হা/৩১৩)*। তবে সর্বপ্রথম হামদ ও ছানা পাঠ করতেন *(আহমাদ, হা/১৫২৬; ছহীহাহ, হা/১৬৯)*। ছাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম বিভিন্ন সময় কবিতা আবৃত্তি, হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) ও নাত (রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা) পাঠ করতেন। যেমন- খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কবিতা পাঠ করেছেন আর ছাহাবীগণ কবিতা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তর প্রদান করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৭২০১)*। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসসান বিন ছাবিতকে কবিতা পাঠের অনুমতি প্রদান করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৩১)*। সুতরাং ইসলামী নাশীদের মাধ্যমে যদি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা এবং ইসলামী আদর্শ ও আখলাকের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়, তাহলে তার উপর ইসলামী শরীআহ উৎসাহ প্রদান করেছে।

প্রশ্ন (২৬): পেটে থাকা অবস্থায় বাচ্চা মারা গেলে গরীবদের কলা, দুধ ও মিষ্টি দেওয়ার কোনো বিধান ইসলামে আছে কি? এক্ষেত্রে অন্য কোনো করণীয় আছে কি?

-ফইজুল ইসলাম
রংপুর।

উত্তর: গর্ভাবস্থায় বাচ্চা মারা গেলে গরীবদের কিছু দেওয়ার বিধান ইসলামে নেই। এক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে করণীয় কিছু নেই। সাধারণভাবে করণীয় হলো ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং আগামীতে সুস্থ ও নেক সন্তান কামনা করা *(আল-বাকারা, ২/১৫৫-১৫৬)*।

প্রশ্ন (২৭): বিবাহের সময় জামাইকে দুধ দিয়ে ভাত মেখে খাওয়ানো, স্ত্রীর স্বামীকে পা ছুয়ে সালাম করা এবং একই গ্লাসে একই শরবত বর ও কনেকে খাওয়ানো হয়। এগুলো কি শরীআত সমর্থন করে?

-ফারহান
নরসিংদী।

উত্তর: এগুলো সব সামাজিক কুসংস্কার। এগুলো অন্য ধর্মের সংস্কৃতি, যার কোনোটার সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। বরং ইসলামে পা ধরে সালাম বা কদমবুসি করা হারাম। তাই কোনো বিশ্বাস রেখে বা বিধর্মীদের ন্যায় এগুলো কাজ করা যাবে না। তবে সাধারণভাবে স্বামী-স্ত্রীর জন্য মিষ্টি বা খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৮): কাঁচা পেঁয়াজ খেতে আমার ভালো লাগে। একজন বলেছেন, এটা খাওয়া যাবে না। কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া কি নাজায়েয?

-সোহেল
চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর: কাঁচা পেঁয়াজ ও কাঁচা রসুন খাওয়া যাবে। তবে খাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া যাবে না। বরং এগুলো খেয়ে ভালোভাবে মিসওয়াক করতে হবে। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছের (পেঁয়াজ বা রসুনের) কিছু খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কারণ ফেরেশতাগণ কষ্ট পান সেসব জিনিসে যাতে মানুষজন কষ্ট পায়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৮৫৪; ছহীহ*

www.al-itisam.com

মুসলিম, হা/৫৬৪)। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, রসুন বা এধরনের সবজি যাতে দুর্গন্ধ রয়েছে, তা পাক করে খাওয়া বৈধ এবং কাঁচা খাওয়াও বৈধ, কিন্তু খেয়ে মসজিদে যাবে না।

প্রশ্ন (২৯): কাউকে 'হুজুর' বলে সম্বোধন করা যাবে কি?

-আল-ইমরান
টেপ্রীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তর: বাংলায় জনাব, মহোদয় বা ইংরেজিতে স্যার এর মতো আমাদের দেশে হুজুর একটি সম্মানসূচক শব্দ, যা সাধারণত আলেম, ইমাম বা দ্বীনদার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সম্মান প্রদর্শনের জন্য হুজুর সম্বোধন করা যায়। তবে হুজুর শব্দের শাব্দিক অর্থ তথা উপস্থিত বিবেচনা করে রাসূল ﷺ-কে সর্বত্র হাযির-নাযির মনে করে তাঁর ব্যাপারে এই শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়, বরং তা শিরক। কেননা তিনি সব জায়গায় উপস্থিত নন এবং গায়েবও জানেন না *(আল-আনআম, ৬/৫৯)*।

প্রশ্ন (৩০): আমার মোট আয় সবটুকু আয়কর নথিতে উল্লেখ করি না। কেননা তাতে অনেক টাকা সরকারকে দিতে হয়। এর পরিবর্তে টাকাগুলো বিভিন্ন মাদরাসা, মসজিদে দান করি এবং কিছু ইয়াতীম ছেলে লালনপালন করি। এটা করা কি বৈধ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: কোনো রাষ্ট্র মুসলিমদের উপর বৈধভাবে কর আরোপ করে এবং তা দেশের নাগরিক সুবিধা, নিরাপত্তা ও জনকল্যাণে ব্যয় করে, তাহলে প্রতারণা করে আয় গোপন করা বৈধ নয়। মাদরাসা-মসজিদে দান করা বা ইয়াতীম লালনপালন করা নিঃসন্দেহে মহৎ কাজ, কিন্তু তা অন্যের প্রাপ্য বা রাষ্ট্রীয় দায় এড়িয়ে করার অনুমতি দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো' *(আল-মায়েদা, ৫/১)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা মানুষের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৮৫)*। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মুসলিমগণ তাদের চুক্তি ও শর্তের উপর অটল থাকবে' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৯৪)*। তিনি আরও বলেছেন, 'যে প্রতারণা করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)*। তবে যদি সরকার যুলম করে অবৈধ কর নেয়, তখন এমন ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। সে এ টাকা দান-ছাদাকা করতে পারে।

প্রশ্ন (৩১): কোনো অনুষ্ঠান বা সম্মেলনের শেষে, যেমন- পরীক্ষার্থীদের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাত করা যাবে কি? না গেলে কেন করা যাবে না? আমরা তো কোনো পাপের কাজ করছি না।

-হোসনে মোবারক
চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উত্তর: কোনো অনুষ্ঠান বা সম্মেলন শেষে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা যাবে না। কেননা এটি একটি ইবাদত, যা স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া করা যাবে না। এটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। যেহেতু শরীআতে রাসূল ﷺ, ছাহাবী, তাবেঈ থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং নতুনভাবে তা চালু করা স্পষ্ট বিদআত। আর করলে ব্যক্তি পাপী হবে। রাসূল ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক বিদআত হলো ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম' *(নাসাঈ, হা/১৫৬০)*। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের বিষয়ে এমন আমল বা কর্ম করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য হিসেবে বিবেচিত হবে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)*।

প্রশ্ন (৩২): Yuzarsif (ইউজারসিফ) নামটি কি রাখা যাবে? মিসরে কি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-কে এই নামে ডাকা হতো? এর অর্থ কী?

-সোহানা আক্তার
পাবনা।

উত্তর: Yuzarsif (ইউজারসিফ) নামটি মূলত ইরানী ধারাবাহিক নাটক Prophet Joseph-এ ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য ব্যবহৃত একটি রূপ। আরবীতে কুরআনে তাঁর নাম এসেছে (يوسف)। ইউজারসিফ নামটি মিসরের আসল ঐতিহাসিক নাম ছিল—এ দাবির নির্ভরযোগ্য ইসলামী বা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং এটি ফারসি/নাট্যরূপে ব্যবহৃত একটি বিকৃত বা রূপান্তরিত উচ্চারণ বলে মনে করা হয়। নামের অর্থ নিয়েও নির্ভরযোগ্য আরবী অভিধানে স্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। অন্যদিকে 'ইউসুফ' নামটি কুরআনী নাম এবং অত্যন্ত উত্তম নাম। এর মূল হিব্রু Yosef, যার অর্থ 'আল্লাহ বৃদ্ধি করুন' বা 'আল্লাহ আরও দান করুন'। অতএব, নবীদের মূল নাম বিকৃত না করে কুরআনে যেভাবে এসেছে সেভাবে নাম রাখা উচিত।

প্রশ্ন (৩৩): নামের শেষে বিভিন্ন উপাধি, যেমন- মাদানী, সালাফী, কাসেমী, জিহাদী, সুফী, ফায়জী বা মাইজভান্ডারী এগুলো লাগানো যাবে কি? শরীআতে এর কোনো ভিত্তি আছে কি?

-মাহিদুল ইসলাম
চট্টগ্রাম।

উত্তর: এগুলো নিসবত বা উপাধি ব্যবহার না করাই উত্তম। কেননা এটা অনেক সময় গর্বের কারণ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন, মুত্তাকী কে' *(আন-নাজম, ৫৩/৩২)*। বরং ব্যক্তির পরিচয় থাকবে বংশের পরিচয়ে। রাসূল ﷺ আশআরী গোত্রের লোকদের ক্ষেত্রে الأشعريين। (উচ্চারণ: আশআরিয়্যীন) শব্দ ব্যবহার করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৮৬)*। তবে অহংকার ছাড়া কেউ করলে সমস্যা নাই।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৪): আমি জানি, ঘরে ছবি রাখা পাপ। ঘরে ছবি থাকলে ফেরেশতা আসে না। কিন্তু আমি যে ঘরে ছালাত পড়ি ঐ ঘরের টিনে মুরগী, ঘোড়া, গরুর ছবি থাকে। এমনকি অনেক মসজিদের ছাপড়ায় উক্ত ছবি থাকে। এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী?

-মো. লোবাব ইসলাম
নাকাইহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর: ইসলামের বিধান হলো টিন বা ছাপড়ায় থাকা প্রাণীগুলোর ছবি যেকোনো মাধ্যমে কালি দিয়ে মুছে দিতে হবে *(সিলসিলা ছহীহাহ, ৪/৫৫৪)*।

প্রশ্ন (৩৫): অনেকে ভিডিওতে কুরআনের কসম দিয়ে বলে, এই ভিডিওটা শেয়ার না করলে কোনো একটা ক্ষতি হতে পারে। এটা বলা যাবে কি বা শেয়ার না দিলে কি আমার কোনো ক্ষতি হবে?

-আকিমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: এই ধরনের উক্তি বলা মিথ্যা ও কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত, যাতে গায়েব জানার দাবি করা এবং দ্বীনের নামে মনগড়া কথা বলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘বলুন, আসমান ও যমিনে যারা আছে তারা গায়েব জানে না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া’ *(আন-নামল, ২৭/৬৫)*। তিনি আরও বলেন, ‘আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলো না, যা তোমরা জান না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৩৩)*। এমনকি তদন্ত ছাড়া কোনো ভিডিও শেয়ার করাও মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫)*। সুতরাং এই ধরনের ভিডিও শেয়ার করা যাবে না এবং শেয়ার না করলে কোনো ক্ষতি হবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘কোনো সংক্রামক নেই এবং কুসংস্কারও নেই’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২২২০)*।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৩৬): একটি হিমাগারে সাধারণ ভাড়া বস্তা প্রতি ৪০০ টাকা আর অগ্রিম ভাড়া বস্তা প্রতি ৩০০ টাকা। অগ্রিম ভাড়া দিলে বস্তা প্রতি সাশ্রয় হয় ১০০ টাকা। অগ্রিম ভাড়া দিয়েছি ৩,০০,০০০ টাকা, কিন্তু আলু গুদামজাত করিনি। এখন যেই হিমাগার অগ্রিম ভাড়া নিয়েছেন সেই হিমাগার আমাকে ৯ মাস পরে অগ্রিম ভাড়ার ৩,০০,০০০ টাকা আর বস্তা প্রতি সাশ্রয়ের ১,০০,০০০ টাকাসহ সর্বমোট ৪,০০,০০০ টাকা ফেরত দিবেন। এই অতিরিক্ত ১,০০,০০০ টাকা সূদ হবে কি?

-আলী হোসেন
রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর সদর।

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত বিবরণ অনুপাতে অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করা সূদ হিসেবে গণ্য হবে এজন্য যে, এখানে কোনো বিনিময় ব্যবহার করা হয়নি। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘প্রত্যেক যে ঋণে মুনাফা বা লাভ নিয়ে আসে তাই হলো সূদ’ *(সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী, ৫/৫৭১)*। সুতরাং প্রদত্ত টাকার চাইতে বেশি গ্রহণ করায় সূদ হিসেবে গণ্য হবে। তবে উক্ত ব্যক্তি বাস্তবে আলু রেখে অগ্রিম প্রদানের জন্য ১০০ টাকা করে বস্তা প্রতি সাশ্রয় গ্রহণ করলে অসুবিধা ছিল না।

পারিবারিক বিষয়

প্রশ্ন (৩৭): স্ত্রী সন্তান নিতে না চাইলে চাপ দেওয়া যাবে কি বা এক্ষেত্রে তালাক দেওয়া যাবে কি? না গেলে কী করা উচিত?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ইসলামে সন্তান গ্রহণ বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলোর একটি। নবী ﷺ অধিক সন্তান জন্মদানে নারীকে বিবাহ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। মাকিল ইবনু ইয়াসার رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক সুন্দরী ও মর্যাদাসম্পন্ন নারীর সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করব? তিনি বললেন, ‘না’। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার এসেও তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার তাঁর নিকট এলে তিনি তাকে বললেন, ‘এমন নারীকে বিয়ে করো, যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব’ *(আবূ দাঊদ, হা/২০৫০)*। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً. ‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের স্ত্রীদের থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রি সৃষ্টি করেছেন’ *(আন-নাহল, ১৬/৭২)*। এই আয়াতের অর্থ এই যে, স্বামী-স্ত্রী যেন গভীর আন্তরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারে, যার ফলে বংশ বৃদ্ধি হয়। আর এটাই হচ্ছে বিয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য। যদি স্ত্রী কোনো শারঈ বা বাস্তবসম্মত কারণ ছাড়াই স্থায়ীভাবে সন্তান নিতে অস্বীকৃতি জানায় আর স্বামী সন্তান কামনা করেন, তাহলে এ অবস্থায় পারস্পরিক সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তালাক দেওয়া যায়।

প্রশ্ন (৩৮): স্বামী তার বেতন বা ইনকাম স্ত্রীকে বলতে চায় না। স্বামী বলে, যা লাগবে সেটা বলো। কিন্তু স্ত্রী বারবার এগুলো নিয়ে ঝামেলা করে। এক্ষেত্রে স্বামী কি মিথ্যা বলতে পারবে বা গোপন করতে পারবে?

-আনোয়ার
রাজশাহী।

www.al-itisam.com

উত্তর: স্বামীর জন্য আবশ্যক নয় স্ত্রীকে বেতনের পরিমাণ বলা এবং স্ত্রীর উচিত নয় এটা নিয়ে ঝামেলা করা। তবে বেতন নিয়ে স্বামীর মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত *(আল-হাজ্জ, ২২/৩০)*।

প্রশ্ন (৩৯): বিয়ের আগে আমি যা টাকাপয়সা ইনকাম করতাম সবটুকু আমার আব্বা নিয়ে নিতেন। বিয়ের পর কিছুদিন অল্প কিছু টাকা আমাকে দিতেন। এখন সাংসারিক ও আমার ব্যক্তিগত কাজে বিভিন্ন সময় আমার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আমি নির্দিষ্ট কিছু টাকা পিতাকে দেই আর বাকিটুকু আমার কাছে রাখি। কিন্তু তিনি পুরোটাই নিতে চান এবং এজন্য ঝামেলা হয়। আমার প্রশ্ন হলো, সন্তানের অর্জিত সম্পদ সব কি পিতাকে দিতে সন্তান বাধ্য?

-তারেক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: সন্তানের অর্জিত সম্পদ পিতা নিতে পারে। তবে পিতাকে তার ছেলে ও বউমার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, ‘তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন খাবে’ *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৩০)*।

প্রশ্ন (৪০): কোনো দম্পতির তিন সন্তান রয়েছে। এরপর তারা আর সন্তান নিতে চায় না। তৃতীয়বার সিজারের পরে রেহেম তথা জরায়ু কেটে ফেলে দেওয়া যাবে কি?

-উম্মে কুলসুম পারভিন
মালিবাগ, ঢাকা।

উত্তর: সিজারের পরে রেহেম তথা জরায়ু (Uterus) ফেলে দেওয়া হারাম ও বড় পাপ। যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় সিজারিয়ান হিস্টেরেক্টমি (Cesarean Hysterectomy) বলা হয়। কেননা স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ করা ইসলামে বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমরাই খাদ্য প্রদান করে থাকি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ’ *(আল-ইসরা, ১৭/৩১)*। তবে স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা বা অন্য কোনো কারণে সাময়িক সময়ের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রক ব্যবহার করতে পারে *(ইবনু মাজাহ, হা/১৯২৮)*। বিস্তারিত দেখুন- আদর্শ পরিবার, ১২১ পৃ.।

প্রশ্ন (৪১): আমার মায়ের সাথে স্ত্রীর ঝামেলা লেগেই থাকে। বাসায় আসলেই বিভিন্ন অভিযোগ। স্ত্রী বাহিরে বাসা নিতে বলে যাতে ঝামেলা না হয়, কিন্তু মা নিতে না করেছে। এখন কি মায়ের কথা শুনব, নাকি স্ত্রীর? উল্লেখ্য, কেউ কাউকে মূলত সহ্য করতে পারে না।

-কাওছার আলী
নওগাঁ সদর।

উত্তর: মা ও স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব হওয়া অনেক পরিবারের সাধারণ সমস্যা। এ অবস্থায় ইসলামের নির্দেশ হলো ধৈর্যধারণ করা, উভয়ের হক্ব আদায় করার চেষ্টা করা, কারও প্রতি যুলম না করা এবং ফিতনা কমানোর ব্যবস্থা করা। প্রথমে মনে রাখতে হবে মায়ের হক্ব অনেক বেশি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে’ *(আল-ইসরা, ১৭/২৩)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার উত্তম সঙ্গ ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হক্বদার কে? তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, ‘তারপর তোমার পিতা’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪৮)*। অন্যদিকে স্ত্রীরও শারঈ হক্ব রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো’ *(আন-নিসা, ৪/১৯)*। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম’ (তিরমিযী, হা/৩৮৯৫)। এ অবস্থায় করণীয়- ১. ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া। ২. স্বামীকে ইনছাফ করতে হবে অর্থাৎ স্ত্রীর সব কথা শুনে মায়ের উপর যুলম করা যাবে না, আবার মায়ের আবেগের কারণে স্ত্রীর হক্ব নষ্ট করাও যাবে না। মানুষের উপর তার স্ত্রী ও পিতা-মাতার সকলের হক্ব রয়েছে। তাই তাকে সবার হক্ব আদায়ে আল্লাহকে ভয় করতে হবে *(মাজমূউল ফাতওয়া, ৩২/২৬১)*। ২. কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না এবং প্রতিনিয়ত ঝামেলা (ঝগড়া, অপমান, গুনাহ ও সম্পর্ক নষ্ট হয়) হচ্ছে। এ অবস্থায় আলাদা বাসা নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে অধিক হিকমতপূর্ণ ও শরীআতসম্মত সমাধান হতে পারে, বিশেষত যদি এতে মা-ছেলের সম্পর্কও ঠিক থাকে, স্বামী-স্ত্রীর সংসারও বাঁচে, ঝগড়া ও গীবত কমে যায়। তবে আলাদা বাসা নেওয়া মানে মাকে পরিত্যাগ করা নয়। বরং নিয়মিত খোঁজ নেওয়া, খরচ বহন করা, সেবা করা, সম্মান বজায় রাখা উচিত।

www.al-itisam.com

উত্তরাধিকার

প্রশ্ন (৪২): জমি ভাগ করার সময় বোনদের ভিটে জমি না দিয়ে তাদের ভাগে সব ধানী জমি দিলে কি অন্যায় হবে? আরেকটি প্রশ্ন হলো, স্বামীর বাড়িতে ঝামেলার জন্য বোন যদি ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা দেখিয়ে জমি নিতে না চায় বা যা দিবে তাই নিবে বলে, তাহলে কি ভাইয়ের কোনো অপরাধ হবে?

-সোহানুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর: পিতামাতার রেখে যাওয়া সব সম্পদে বোনদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং তাদের সম্মতি ব্যতীত তাদেরকে ভিটে জমি থেকে বঞ্চিত করা অবশ্যই অন্যায় হবে *(আন-নিসা, ৪/১১-১২; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১০৮২)*। বোনের স্বামীর বাড়িতে ঝামেলার সঙ্গে জমি বণ্টনের কোনো সম্পর্ক নেই। ভাইদের এমন মানসিকতা প্রদর্শন করা উচিত নয় যে, বোনেরা আশঙ্কা করবে, জমি গ্রহণ করলে হয়তো ভাইয়েরা বিপদে এগিয়ে আসবে না। বরং ভাইদের উচিত শরীআত মোতাবেক জমি বণ্টন করে দেওয়া এবং আশ্বাস দেওয়া যে, অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদে তারা পাশে থাকবে।

প্রশ্ন (৪৩): স্বামী মারা গেছে। কিন্তু স্বামীর উপার্জন করা প্রায় ৮৪+ লক্ষ টাকা ব্যাংকে রাখা আছে তার মাকে নমিনি করে। স্বামীর পরিবার যেহেতু তাদের বউমাকে পছন্দ করে না, তাই তারা অল্প কিছু (৫ লাখ) টাকা দিয়ে বাকি টাকার কোনো অংশ দিতে চাচ্ছে না। এখন নিজের হক আদায়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা বা অন্য কিছু করা যাবে কি? উল্লেখ্য, স্বামী ২ ছেলেমেয়ে রেখে মারা যায়, তাদের দেখাশুনা করে তাদের মা।

-নাসরিন আক্তার
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: বাবার রেখে যাওয়া সম্পদে ছেলেমেয়ে ও তাদের মায়ের আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত অংশ রয়েছে। এক্ষেত্রে তার রেখে যাওয়া সম্পদের প্রাপ্ত অংশ সামাজিকভাবে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। তারা যদি দিতে না চায় এবং বাড়াবাড়ি করে, তাহলে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য আইনি ব্যবস্থা হিসেবে মামলা করতে পারে। কেননা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দিয়েছেন *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৬৫; নাসাঈ, হা/৩৬৪১)*। দাদা-দাদির উচিত তাদের নাতি-নাতনির সম্পদের প্রাপ্ত হক বুঝিয়ে দেওয়া। অন্যথায় অন্যের হক নষ্ট করার পাপে তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮১)*।

নারী বিষয়ক

প্রশ্ন (৪৪): নারীরা কি অনলাইনে ব্যবসা করতে পারবে? ব্যবসায় বিভিন্ন মানুষের সাথে মেসেজ করতে হয় বা উত্তর দিতে হয় (ভয়েসে কথা বলা হয় না)। এভাবে ব্যবসায় কোনো শারঈ নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-সারা জাহান
নাটোর।

উত্তর: প্রথমত, ইসলাম কোনো নারীর উপর উপার্জনের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি, বরং তার যাবতীয় খরচের দায়িত্ব তার অভিভাবককে প্রদান করেছে। অতএব, অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও শুধু স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে কোনো নারীর জন্য উপার্জনের এমন মাধ্যম গ্রহণ করা জায়েয নয়, যাতে পরপুরুষের সাথে নিয়মিত কথা বলার প্রয়োজন পড়ে। দ্বিতীয়ত, খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো কেউ না থাকলে নারীর জন্য উপার্জনের এমন মাধ্যম গ্রহণ করা জায়েয, যা হবে নারীকেন্দ্রিক। সুতরাং অনলাইনে নারীদের সাথে কথা বলে বা যোগাযোগ করে ব্যবসা করা একজন নারীর জন্য জায়েয। পক্ষান্তরে পরপুরুষের সাথে যোগাযোগ করে বা কথা বলে (যদিও মেসেজের মাধ্যমে হয়) ব্যবসা করা তার জন্য উত্তম নয়। কারণ পরপুরুষের সাথে মেসেজের মাধ্যমে কথা বলা খলওয়াত বা নির্জন পরিবেশে কথা বলার শামিল, যা উচিত নয় *(ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৬)*। সেক্ষেত্রে মাহরামের মধ্যমে বা সহযোগিতা নিয়ে কর্মচারী রাখতে পারে।

কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন (৪৫): একই হাদীছ কোনো ইমাম ছহীহ বলেছেন, কোনো ইমাম হাসান, আবার কোনো ইমাম যঈফ বলেছেন। এমন হওয়ার কারণ কী? আমরা সাধারণ মানুষ কোনটি গ্রহণ করব?

-আবু শামসের
চট্টগ্রাম।

উত্তর: একই হাদীছ সম্পর্কে কোনো মুহাদ্দিছ ‘ছহীহ’, কেউ ‘হাসান’, আবার কেউ ‘যঈফ’ বলেছেন- এটি হাদীছশাস্ত্রের স্বাভাবিক একটি বিষয়। কারণ হাদীছ বিশুদ্ধতার বিচার ইজতিহাদভিত্তিক অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহর নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে মুহাদ্দিছগণ গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেন। এ পার্থক্যের কয়েকটি প্রধান কারণ নিচে তুলে ধরা হলো- ১. বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ তথা কোনো রাবীকে একজন ইমাম

www.al-itisam.com

নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, অন্যজন দুর্বল মনে করেছেন। ফলে একই হাদীছের হুকুম ভিন্ন হয়েছে *(মীযানুল ই'তিদাল, ১/১৬)*। ২. কারো নিকট অতিরিক্ত সনদ পৌঁছেছে, কারো নিকট পৌঁছেনি তথা একজন মুহাদ্দিছ কোনো হাদীছের একাধিক সনদ পেয়ে সেটিকে শক্তিশালী বলেছেন; অন্যজন সে সনদ পাননি, তাই তিনি দুর্বল বলেছেন *(মুকাদ্দিমা লি-ইবনে ছলাহ, ৪৩; তাদরীবুর রাবী, ১/১৪০)*। ৩. ইল্লত (গোপন ত্রুটি) সম্পর্কে মতভেদ তথা কখনো হাদীছে সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে, যা সবাই ধরতে পারেন না। কেউ তা আবিষ্কার করে হাদীছকে দুর্বল বলেছেন, অন্যজন তা না দেখে গ্রহণ করেছেন (মুকাদ্দিমা লি-ইবনে ছলাহ, ৯৮)। ৪. 'হাসান' ও 'ছহীহ' এর মানদণ্ডে পার্থক্য তথা কিছু ইমাম শর্তে কঠোর, কিছু ইমাম তুলনামূলক সহজ। এজন্য একই হাদীছ একজনের কাছে 'হাসান', অন্যজনের কাছে 'ছহীহ' হতে পারে *(তাদরীবুর রাবী, ১/৮৭)*। ৫. ইজতিহাদে ভুল-শুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক তথা হাদীছ যাচাই একটি গভীর গবেষণামূলক কাজ। তাই মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক, যেমন ফিক্বহের মাসআলায় মুজতাহিদদের মতভেদ হয়। সাধারণ মানুষের জন্য করণীয়- ১. নির্ভরযোগ্য আলেম ও মুহাদ্দিছগণের অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো' *(আন-নাহল, ১৬/৪৩)*। ২. দলীল ও গবেষণায় শক্তিশালী মত গ্রহণ করা। যে মতের পক্ষে অধিক মুহাদ্দিছ, শক্তিশালী দলীল ও বিশ্লেষণ রয়েছে সেটি গ্রহণ করা উচিত। ৩. খেয়াল-খুশিমতো সহজ মত খোঁজা যাবে না। যে মত নিজের প্রবৃত্তির অনুকূলে, শুধু সেটিই গ্রহণ করা বৈধ নয়। বরং সত্যের কাছাকাছি মত গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে' *(ছোয়াদ, ৩৮/২৬)*।

প্রশ্ন (৪৬): সূরা ইয়াসীনের প্রথম ৯ আয়াত পড়লে শত্রুর চোখ অন্ধ হয়ে যায়, একথা কি সঠিক? সূরা ইয়াসীনের ফযীলত আছে কি?

-মো. তানভীর হাসান রায়হান
অক্সিজেন মোড়, চট্টগ্রাম।

উত্তর: সূরা ইয়াসীন এর প্রথম ৯ আয়াত পড়লে শত্রুর চোখ অন্ধ হয়ে যায়, মর্মে কথাটি মিথ্যা ও বানোয়াট। সুরা ইয়াসীনের ফযীলত বিষয়ে বর্ণিত প্রায় বর্ণনাগুলো যঈফ ও জাল, যা নবী ﷺ থেকে মারফূ সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত নয়। কুরআনের অন্যান্য যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সূরা ইয়াসীনও তার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (৪৭): 'বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স' কর্তৃক প্রকাশিত কুরআনুল কারীম এর সূরা আল-কাহফ এর বৈশিষ্ট্যে উল্লেখ করা হয়েছে, 'যেভাবে সূরা আল-কাহফ নাযিল হয়েছে সেভাবে কেউ তা পড়লে সেটা তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর বা আলোকবর্তিকা হবে' *(মুস্তাদরাকে হাকিম, ১/৫৬৪)*। আমার জানার বিষয় হলো, কীভাবে সূরা আল-কাহফ নাযিল হয়েছিল? এই সূরার আর কোনো ফযীলত আছে কি?

-মো. সিরাজুল ইসলাম
জোরবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর: হাদীছের বাক্য 'যেভাবে নাযিল হয়েছে' দ্বারা কোনো ঘটনা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং কুরআনুল কারীমের মুছহাফে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে তিলাওয়াত করা বুঝানো উদ্দেশ্য। আর সূরা কাহফের ফযীলত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হলো- ১. আবূদ দারদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৮০৯)*। ২. বারা বিন আযিব রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ তিলাওয়াত করছিলেন। তার ঘোড়াটি দুটি রশি দিয়ে তার পাশে বাঁধা ছিল। তখন এক টুকরো মেঘ এসে তাকে ছায়া দান করল। মেঘখণ্ড ক্রমেই নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। তখন তার ঘোড়াটি লাফালাফি শুরু করে দিল। সকালবেলা যখন লোকটি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল, তখন তিনি বললেন, 'এটা ছিল সাকীনা (প্রশান্তি), যা কুরআন তিলাওয়াতের কারণে নাযিল হয়েছিল *(ছহীহ বুখারী, হা/৫০১১)*। ৩. আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহফ তিলাওয়াত করবে তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময়টি নূর বা আলোকিত হবে' *(ছহীহ আত-তারগীব, আলবানী, হা/৭৩৬)*।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৮): একটি পোশাক কিনেছি। বাসায় আসার পর দেখি ভেতরে ছেঁড়া রয়েছে। পরদিন দোকানে নিয়ে গেলে তিনি ফেরত নিতে চান না। তিনি বলেন, বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া হয় না এটা তো ব্যাগে লেখা আছে। ইসলাম এ ব্যাপারে কী বলে?

-মুনতাসির বিল্লাহ
নওগাঁ।

উত্তর: ক্রেতার দায়িত্ব হলো পণ্য ক্রয় করার সময় পণ্যটি ভালোভাবে যাচাই করে বুঝে নেওয়া। কেননা পণ্য বুঝে নিয়ে চলে যাওয়ার পর কোনো ত্রুটি প্রকাশ পেলে বিক্রেতা পণ্য ফেরত নিতে বা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.al-itisam.com

বলেন, ‘যদি তারা (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের কেউ যদি তা পরিত্যাগ না করে, তবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২১১২)*। তবে খিয়ার তথা ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখা বা বাতিল করার শর্ত থাকলে ফেরত নেওয়া উচিত। রাসূল ﷺ বলেন, ‘মুসলিমরা তাদের শর্তের উপর অটল থাকতে বাধ্য’ *(তিরমিযী, হা/১৩৫২; ইবনু মাজাহ, হা/২৩৫৩)*। তবে বিক্রিত পণ্যে কোনো ত্রুটি বা পণ্য পছন্দ না হলে মানবিক কারণে ফেরত নেওয়া ছওয়াবের কাজ, তবে বিক্রেতা বাধ্য নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের (ক্রয়-বিক্রয়ের) ভুল বা অনুতাপ মাফ করে দেয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেবেন’ *(আবূ দাঊদ, হা/৩৪৬০)*। অর্থাৎ কেউ ক্রয়কৃত জিনিস ফেরত দিতে চাইলে বা চুক্তি বাতিল করতে চাইলে তাকে সুযোগ দেওয়া।

প্রশ্ন (৪৯): আমার ছোট ভাই একবার কসম করে বলল, আল্লাহর কসম! তোমাকে আজকে বাজারে যেতে দিব না, তারপরও আমি সেদিন বাজারে যাই। এখন কি তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে?

মো. জয়নাল বিন বাবুল
চকশিমলা, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর: প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী কসমকারী ব্যক্তিকে কাফফারা আদায় করতে হবে। কাফফারা হলো দশজন মিসকীনকে খাবার অথবা পোশাক দিতে হবে অথবা কোনো দাসকে মুক্ত করতে হবে। যদি সক্ষম না হয় তাহলে তিনদিন ছিয়াম পালন করতে হবে *(আল-মায়েদা, ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (৫০): এক ব্যক্তি একটি বিচারে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে। কোর্টে তার রায় ফায়সালা হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন পর এখন সে তওবা করেছে এবং ঐ ব্যক্তির কাছে মাফ চেয়েছে। প্রশ্ন হলো সেই ব্যক্তির কি কোনো কাফফারা দিতে হবে?

-ওবাইদ
ফরিদপুর।

উত্তর: মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া মহাপাপ। নবী করীম ﷺ-কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া’ *(ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫৩)*। উল্লিখিত ব্যক্তি যেহেতু তওবা করেছে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তবে বান্দার কোনো হক্ব নষ্ট হলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর এই পাপের আলাদা কোনো কাফফারা নেই।

সম্পাদকীয়র বাকি অংশ

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.২ শতাংশ ইয়াহূদী। অথচ ১৯০১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত মোট নোবেল পুরস্কারের ২২ শতাংশ পেয়েছেন ইয়াহূদীরা। পদার্থবিদ্যায় ২৪ শতাংশ, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ২৬ শতাংশ, অর্থনীতিতে ৪০ শতাংশ। অন্যদিকে মুসলিমরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৫.৮ শতাংশ। কিন্তু বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের মাত্র ২.৩৮ শতাংশ পেয়েছেন মুসলিমরা। দেড়শ কোটি মানুষের বিপরীতে মাত্র মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী। এই সংখ্যা লজ্জার নয়, এটি সতর্কতার সংকেত।

ইয়াহূদীরা সামাজিক ও পারিবারিকভাবে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষাকেন্দ্রিক। অথচ আফসোস করে বলতে হয়, বাংলাদেশের বাড়িতে বাড়িতে বিশ্বকাপের বিভিন্ন দেশের পতাকা ঝুলছে। গাযার শিশুগুলোর গায়ে তার প্রিয় খেলোয়াড়ের জার্সি শোভা পাচ্ছে। ক্ষুধার্ত পেটে তারাও মেতে উঠছে বিশ্বকাপ উন্মাদনায়। অথচ ঠিক তার উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান সমাজে। এই যদি হয় এই উম্মতের অবস্থা, তাহলে মুক্তি কোথায়?

যে সমাজে ৩৯ দিনের একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে, সেখানে কতটুকু আলোচনা হয় জ্ঞান, গবেষণা, দাওয়াহ, সমাজ নির্মাণ নিয়ে? যে তরুণ রাত তিনটায় গোল দেখে চিৎকার করে, সে কি বিকেল চারটায় লাইব্রেরিতে বসে? যে পরিবার একসঙ্গে বিশ্বকাপ দেখে, সে পরিবারে কুরআনের তেলাওয়াত কতক্ষণ?

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীরা বীজগণিত আবিষ্কার করেছেন, অপটিক্স লিখেছেন, মানচিত্র এঁকেছেন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইবনু সিনা, আল-বিরুনী, ইবনুল হাইসাম—তাঁরা সময় নষ্ট করেননি। তাঁরা দেখেছিলেন কুরআনের সেই আহ্বান—‘পড়ো, তোমার রবের নামে’।

সেই আহ্বান আজও বলবৎ। প্রশ্ন হলো, আমরা শুনছি কি?

বিশ্বকাপের হইচই যখন থামবে, মাঠের ঘাস শুকিয়ে যাবে, বিজয়ীর উল্লাস মিলিয়ে যাবে—তখনও থাকবে সেই একই প্রশ্ন: উম্মাহ কোথায় যাচ্ছে? কোন খাতে তার সময়, মেধা ও শক্তি ব্যয় হচ্ছে? যে জাতি নিজের ইতিহাস ভুলে অন্য দেশের দলের জয়ে মাতে, সেই জাতির নিজস্ব বিজয়ের দিন কবে আসবে?

একটি ম্যাচের জয়-পরাজয়ে যদি আমাদের ঘুম হারিয়ে যায়, একটি বিদেশি দলের পতাকা টানাতে যদি আমাদের অস্বাভাবিক অর্থ ব্যয় হয়, ফজরের ছালাত, পড়াশোনা, পরিবার এবং দায়িত্ব যদি পিছিয়ে যায়, সামাজিক সমস্যার চেয়ে খেলোয়াড়ের ইনজুরি যদি আমাদের বেশি বিচলিত করে, তাহলে থামতে হবে।

প্রশ্ন করতে হবে— আমরা বিনোদন করছি, নাকি ধীরে ধীরে বিনোদনের দাসে পরিণত হচ্ছি? *(প্র. স.)*

www.al-itisam.com

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১

নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০

নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩

নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬

বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩

বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭

বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বাঁরহাটাব-হাটাব, বিরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৩৬-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

মাকতাবাতুস সালাফ

রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ড. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু হামূদ আল ফুরাইহ

মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর পথনির্দেশনা অনুসরণ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তিনি শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন।

এই বইটিতে রাসূল ﷺ-এর দৈনন্দিন জীবনের সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব সুন্নাতগুলো সহজভাবে ধারাবাহিক আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন: ছালাতের সুন্নাত, ঘুমানোর আগে ও পরে সুন্নাত, সকাল-সন্ধ্যার সুন্নাত, দু'আর সুন্নাত ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠক সহজে তা বুঝতে পারেন।

আমরা আশা করি, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাঠকদের মধ্যে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে এবং তাদের জীবন আলোকিত করবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন এবং এই বইকে আমাদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহর মাধ্যম বানান- আমীন!



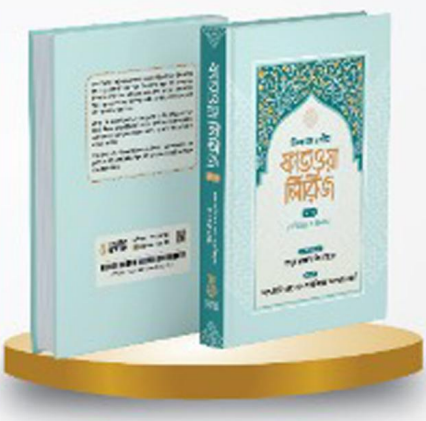
পৃষ্ঠা: ১৪৪

মূল্য: ১৩০৳

ফিকহুল হাদীছ ফাতওয়া সিরিজ

সংকলনে: আল-জামিআহ আস সালাফিয়্যাহ ফাতওয়া বোর্ড

বোর্ড প্রধান: আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ



ইসলামী জীবনের প্রথম শর্ত পবিত্রতা, আর তার সর্বোচ্চ প্রকাশ সালাত। এই দুই ইবাদতের শুদ্ধতা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। "ফিকহুল হাদীস ফাতওয়া সিরিজ"-এর এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে আল-ইতিছাম-এ প্রকাশিত দলিলভিত্তিক ফাতওয়াগুলোর বাছাইকৃত অংশ, সাথে সংযোজিত হয়েছে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক বিষয়।

পুরো গ্রন্থজুড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পবিত্রতা ও সালাত-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। ওযু, গুসল, নাপাকি, মহিলাদের মাসিক অবস্থা, সালাতের রুকন ও শর্ত, জামাআত, ইমামতি, ভ্রমণকালীন নামায-সবই এখানে সাজানো হয়েছে দলিল ও ফিকহি বিশ্লেষণের আলোকে।

এই সংকলন পাঠককে ইবাদতের সঠিক অনুশীলনে সহায়ক ও শরঈ নির্দেশনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

পৃষ্ঠা: ৪৬৪

মূল্য: ৫৮০৳

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf